Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

## শরীয়াহ নাকি সেকুলারিজম, কোনটা উত্তম?


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সারাহ ইসলাম

রোলঃ 227021436



২৫ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## শরীয়াহ নাকি সেকুলারিজম, কোনটা উত্তম?

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সারাহ ইসলাম

রোলঃ 227021436

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

### প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "শরীয়াহ নাকি সেকুলারিজম, কোনটা উত্তম?" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সারাহ ইসলাম, আইডিঃ 227021436 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান

তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " শরীয়াহ নাকি সেকুলারিজম, কোনটা উত্তম? " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

**সারাহ ইসলাম**

আইডিঃ 227021436

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২৫ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

# সূচিপত্র


সেকুলারিজম কি? .......................................................................................................5

উৎপত্তি:......................................................................................................................5

সেকুলারিজমের ইসলামিকরণ: .....................................................................................6

শরীয়াতের দণ্ড সমূহ: ..................................................................................................13

শরীয়তের কর্তৃত্ব সম্পর্কে আধুনিক তর্কবিতর্কের বাস্তব অবস্থা অনুধাবনের কয়েকটি মূলনীতি:.....................................................................................................................16

বিপর্যস্ত মানবতা : .....................................................................................................21

মুসলিম বিশ্বের সেকুলারিজম : ...................................................................................28

ধর্ম যার যার:.............................................................................................................32

উপসংহার:..................................................................................................................36

এই মূলনীতি জোরদার করার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো ভূমিকা রাখবে: ................................37

তথ্য সূত্র: ...................................................................................................................41

## সেকুলারিজম কি?

সেকুলারিজম অর্থ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। সেকুলারিজম শব্দটির বিস্তৃত অর্থ রয়েছে। তবে ধর্মনিরপেক্ষবাদ বলতে সাধারণত রাষ্ট্র আর ধর্মকে পৃথকরূপে প্রকাশ করাকে বুঝায়। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে ধর্মীয় রীতি-নীতির বাইরে থেকে পরিচালনা করাকে বোঝানো হয়। সেক্ষেত্রে আইন নির্দিষ্ট ধর্মের উপর নির্ভরশীল থাকে না। এছাড়া ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ধর্মীয় মতবাদকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। রাষ্ট্র কোন ধর্মকেই পক্ষপাত করেনা। এই মতবাদ অনুযায়ী সরকার কোনরূপ ধর্মীয় হস্তক্ষেপ করবে না, কোন ধর্মীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী হবে না এবং কোন ধর্মকে কোন প্রকার অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা প্রদান করবে না। কাউকে ধর্মপালনে বাধ্য করা হবে না। সকল ধর্মের মানুষ সমান অধিকার ভোগ করবে।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো, তথ্য এবং প্রমাণের উপর নির্ভর করে কোন ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর নয়। অর্থাৎ বলা যায়, “ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার”।

রাজনৈতিক ব্যবহারের দিক থেকে বলা হয় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হল ধর্ম এবং রাষ্ট্রকে পৃথক করার আন্দোলন, যাতে ধর্মভিত্তিক আইনের বদলে সাধারণ আইন জারি এবং সকল প্রকার ধর্মীয় ভেদাভেদ মুক্ত সমাজ গড়ার আহ্বান জানানো হয়।

## উৎপত্তি:

ধর্মনিরপেক্ষতা বা সেকুলারিজম শব্দটি ১৮৫১ সালে ব্রিটিশ লেখক জর্জ জ্যাকব ইলিয়াক প্রথমবার ব্যবহার করেন। জর্জ জেকব ধর্মের কোনরকম সমালোচনা ছাড়াই সমাজের শৃঙ্খলা আনয়নের জন্য তার এই ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা প্রকাশ করেন। তিনি এই মতবাদকে আরো বিস্তৃত করেন এবং বলেন যে, “ধর্মনিরপেক্ষতা খ্রিস্ট ধর্মের বিরুদ্ধের কোন মতবাদ নয়। এটি একটি স্বাধীন স্বত্তা। ধর্মের অস্তিত্ব নিয়ে এটি কোন প্রশ্ন তোলে না, কিন্তু অন্যদের ধর্মনিরপেক্ষ হতে উৎসাহিত করে।”

বেরি কসমিং যিনি ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে আরো গবেষণা করেন তিনি এটিকে দুইটি অংশে বিভক্ত করেন; ১) কঠোর ধর্মনিরপেক্ষতা, ২) নমনীয় ধর্ম নিরপেক্ষতা।

ধর্ম কি?

ধর্ম হল একাধিক অর্থ বাচক একটি শব্দ। সাধারণত এটি দ্বারা সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থার একটি পরিসরকে বোঝায়, যার মধ্যে রয়েছে মনোনীত আচরণ ও

অনুশীলন, নৈতিকতা, বিশ্বাস, বিশ্ব দর্শন, পাঠ্য, পবিত্র স্থান, ভবিষ্যৎবাণী, নীতিশাস্ত্র বা সংগঠন যা সাধারণত মানবতাকে অতিপ্রাকৃত, অতীন্দ্রিয় ও আধ্যাত্মিক উপাদানের সাথে সম্পর্কিত করে। যদিও ধর্ম সুনির্দিষ্টভাবে কিসের সমন্বয়ে গঠিত হয় তা নিয়ে পন্ডিতদের মাঝে কোন ঐক্যমত নেই।

## সেকুলারিজমের ইসলামিকরণ:

ধর্মের সাথে এক দীর্ঘ ঐতিহাসিক যুদ্ধের পর সেকুলার সংস্কৃতি বর্তমান পশ্চিমা বিশ্বের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। পশ্চিমা সমাজের রাজনীতি আইন কানুনের ওপর সেকুলারিজমের প্রাধান্য একচ্ছত্র। এমনকি খ্রিস্টধর্মের উপরেও সেকুলারিজমের নিয়ন্ত্রণ। বিজয়ী এ সংস্কৃতি কেবল ধর্মকে দূরে সরিয়েই ক্ষান্ত হয়নি বরং মানুষকে ধর্মত্যাগে,ধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে এবং ধর্মের ব্যাপারে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনে ভূমিকা রেখেছে।

ধর্মের উপর সেকুলারিজম এর আক্রমণ এতই বেড়ে গিয়েছে যে,মানুষ ধারণা করতে শুরু করেছে,পশ্চিমা সমাজে ধর্মের অস্তিত্ব চলে যাওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র সেকুলারিজমের এই উত্থানের অবসম্ভাবী পরিণত হবে ধর্ম বিলীন হয়ে যাওয়া।

পশ্চিমে ধর্মের সাথে সেকুলারিজমের এই সংঘাত এখনো বন্ধ হয়নি। বরং সমগ্র বিশ্বে সম্ভাব্য সকল উপায়ে ছড়িয়ে পড়েছে এবং মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র প্রভাব বিস্তার করেছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলিমদের উপর এর বড় মাত্রার প্রভাব দেখা গিয়েছে। কিছু মানুষ মনে করে,পশ্চিমা বিশ্বে সেকুলারিজম যে ভূমিকায় রেখেছে, মুসলিম বিশ্ব একি ভূমিকা রাখবে।

কিন্তু ইসলাম তো খ্রিস্টধর্ম নয়। মুসলিমদের হৃদয়ের দিনের অবস্থা পশ্চিম সমাজের মতো নয়। ইউরোপের ইতিহাসে ধর্মের যে সংকট তার সাথে মুসলিমরা পরিচিত নয়। তাই মুসলিম বিশ্বে এসে সেক্যুলারিজম একটা সংকটে পড়ে গিয়েছে।

এখানে সংকটটা মূলত ইসলামের সাথে সেকুলারিজমের দ্বন্দ্বের জায়গা থেকে সেকুলারিজম এমন এক নমুনা ইসলাম এর সাথে সাংঘর্ষিক দুয়ের মাঝে সমন্বয় করা সম্ভব নয় একটা সেকুলার নীতির অধীনে ইসলাম ব্যক্তিগত বছরের বিষয় হওয়া সম্ভব নয় ইসলামে এটি অকল্পনীয় জীবনের ব্যবহারিক দিকগুলো থেকে ইসলামকে সরিয়ে দিয়ে মুসলিমরা দিন থেকে দূরে জীবন যাপন করবে এমনটা ভাবাও যায় না

মুসলিম সমাজ থেকে বিরোধ এবং প্রত্যাখ্যান বেশি পরিমাণে পাওয়ার পর সেকুলারিজমের সংকট আরো তীব্র হয়েছে। সেকুলাররা মুসলিম সমাজে এটি উপলব্ধি করেছে। এই সংকটে তারা কি ভূমিকা রাখবে তা নিয়ে তাদের নানা রকম অবস্থান দেখা যায়। কোন কোন চিন্তাবিদ্য সেকুলারিজম পরিভাষা বাদ দিয়ে ভিন্ন পরিভাষা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন।

এ সম্পর্কে উচ্চারণের জন্য সবচেয়ে ফলপ্রসূ যে ভূমিকা সেকুলাররা নিয়েছে তা হলো সরাসরি ইসলামের বিধি বিধান অস্বীকার করা থেকে দূরে থাকা। দ্বীন ও সেকুলারিজম এবং ইসলাম ও মর্ডান নিজামের মাঝে সমন্বয়ের সর্বাত্মক চেষ্টা রাখা। শারিয়াত এর টেক্সটের নতুন পাঠ আবিষ্কার করে সেকুলারিজম ও ইসলামের দ্বন্দ্ব ঘুচানোর প্রচেষ্টা চালানো। ফলে আধুনিক কিছু পরিভাষার মাধ্যমে ইসলামের সঙ্গে এর কোন প্রকার সংঘাত নাকচ করে দেওয়া।

সেকুলারিজমের ইসলামীকরণ দুই ভাবে প্রকাশ পায়। যথা;

প্রথম ধরন; ইসলামকে নিছক আধ্যাত্মিক বার্তা হিসেবে উপস্থাপন করা। ইসলাম সৃষ্টি ও স্রষ্টার মাঝে যোগাযোগ স্থাপনের মাঝে সীমিত। এখানে জনজীবনে কোন কিছু আরোপ করার বিষয় নেই। এভাবে সেকুলারিজমকে ইসলামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলা যাবে।

কিছু সেকুলার গোষ্ঠী এটি করার চেষ্টা করছে। তবে পদ্ধতিটা প্রকাশ্য তাই খুব কম মুসলিমই এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। কারণ এটি যে ভুল পদ্ধতি তা খুবই স্পষ্ট এবং প্রত্যেক মুসলিম জানে যে, ইসলাম কিছু শারীরিক ইবাদতের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়।

দ্বিতীয় ধরন; জনজীবনে কিছু বিধি-বিধানের উপস্থিতি স্বীকার করে নিবে কিন্তু বিপরীতে রাজনীতিতে সেকুলারিজম কে গ্রহণ করবে।

রাজনীতিবিহীন ইসলাম সে স্বীকার করবে না। শরীয়তের নির্দিষ্ট বিধি-বিধান নেই সেটিও সে বলবে না। কিন্তু সে সেকুলার রাজনীতির সাথে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করবে। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কোন ধর্মীয় নীতির অনুসরণ করার বিষয়টি সে মেনে নিবে না।

এটি কেবল সেকুলার গোষ্ঠীর মাঝেই সীমিত নেই। এমন অনেকে আছেন যারা সেকুলারিজম অস্বীকার করে এবং ইসলামী বিধি বিধান অনুসরণের কথা বলে, তারাও বিভিন্ন বিষয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই পথ অনুসরণ করে।

প্রথম ভুল এত স্পষ্ট যে মানুষের মনে এটি নিয়ে সংশয় তৈরি হয় না। শরীয়তের সাথে এটি স্পষ্ট সাংঘর্ষিক। কিন্তু সমস্যাটা হয় দ্বিতীয় পথ নিয়ে, কারণ এটি ইসলামের সাথে সেকুলারিজমের সমন্বয়ের প্রচেষ্টা চালায়।

আমাদের বর্তমান বাস্তবতায় এর উপস্থিতি খুবই স্পষ্ট। গত কয়েক দশকের মাঝে এটি ছড়িয়ে পড়েছে। রাজনীতিতে অংশগ্রহণকারী অনেকের কারণে এর প্রভাব আরো বেড়ে গিয়েছে, তারা দেখেছে বর্তমান বাস্তবতার দাবি হলো এই সেকুলার তথ্য সমূহের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া হয়েছে। এটি প্রমাণে তারা শরীয়তের বিভিন্ন দলিল পেশ করছে। তারা তা এমনভাবে উপস্থাপন করছে যেন সেকুলার রাজনীতির সাথে ইসলামের কোন সংঘর্ষ না থাকে।

সেকুলারিজমের ইসলামীকরণের সমালোচনায় আমরা বাস্তবতার পরিবর্তন সম্পর্কে তাদের অনুধাবনের সমালোচনা করব না। বরং সমস্যাটা হল এই অনুধাবনের কারণে শরীয়তের বিধি-বিধানের বিকৃতি সাধন এবং দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যাওয়া। বাস্তবতাকে তারা বুঝেছে, তবে তা আংশিক। তারা সমস্যাটা বুঝতে পেরেছে। কিন্তু তার সাথে উপযুক্ত আচরণ করতে সক্ষম হয়নি। বরং ভূমিকা রেখেছে নতুন সমস্যা সৃষ্টিতে। অথচ শরীয়াতের দৃষ্টিতে তাকালে তারা এমন সংকীর্ণতায় ঢুকে পড়া থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারতো।

সংস্কার সাধন, স্বাধীনতা অর্জন, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা, অধিকার রক্ষা, জুলুম প্রতিরোধ এরকম কিছু মূল্যবোধ অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করার ক্ষেত্রে তাদের সাথে মতবিরোধ নেই। বরং সমস্যাটা হলো এগুলোর জন্য সেকুলার পদ্ধতি গ্রহণ করা এবং সেকুলারিজমের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে শরিয়াতের নতুন ব্যাখ্যা হাজির করা।

এই গবেষণাপত্রটি এমন চিন্তা চেতনায় প্রভাবিত লোকদের সাথে শরয়ীত ও বুদ্ধিবৃত্তিক সংলাপের জন্য, যারা ইসলামের বিধি-বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং সেগুলোর

চিন্তাভাবনাকে বর্জন করে কিন্তু তাদের দৃষ্টিতে ইসলামের সাথে মিলে যায় এমন চিন্তাগুলোকে নিঃসংকচে গ্রহণ করে।

এমনই কিছু ভাবনার সমালোচনায় এই গবেষণা পত্র। সেকুলার রাজনীতির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টায় যে ভুল পথের অনুসরণ হচ্ছে তা তুলে ধরা। সুতরাং এটা মুসলিমদের মধ্যকার অভ্যন্তরীণ সমালোচনা। কারণ আমরা এবং গবেষণাপত্রের কাঙ্ক্ষিত পাঠকেরা উভয়ে ইসলামের নির্দেশনাকে মেনে চলি। পাঠকদের মাঝে কেউ যদি না থাকেন, তাহলে এই গবেষণাপত্রের উদ্দেষ্টি ব্যক্তি তিনি নন।

সেকুলারিজমের রাজনৈতিক দর্শন হলো ধর্ম ও রাষ্ট্র আলাদা থাকবে। ধর্ম হলো সৃষ্টি ও স্রষ্টার মাঝে আধ্যাত্মিক সম্পর্কের নাম। সামাজিক জীবনের বৃহৎ অঙ্গনে এর প্রভাব অনুপস্থিত। এই চিন্তা ভাবনা ইসলামের সাথে মৌলিকভাবে সাংঘর্ষিক। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। মানুষের জীবনের প্রতিটা স্তর ইসলামের দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত। কেবল বান্দা আর রবের মধ্যকার দায়িত্বসমূহ পালনই ইসলামে সীমাবদ্ধ নয়। এক মানুষের সাথে অন্য মানুষের সম্পর্ক কেমন হবে এবং মুসলিমদের মধ্যকার সংঘর্ষে ফয়সালা কিভাবে হবে তাও ইসলামে বলা আছে। ইসলামের রয়েছে এক সুচিন্তিত রূপরেখা। যেটা সেকুলারিজম পছন্দ করেনা। কেবল দ্বীন বা ওহীর প্রাধান্য বা কর্তৃত্ব থাকবে। যেটা সকলে অনুসরণ করবে এমনটা ইসলাম সমর্থন করেনা। শরীয়তের কর্তৃত্ব কিংবা শরীয়তকে বিধান বলে মেনে নেওয়া বেশ কিছু ক্ষেত্রে কে অন্তর্ভুক্ত করে যেমন, আকিদা; একজন মুসলিম মনে করে যে আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা হালাল আর তিনি যা হারাম করেছেন তা হারাম। শরীয়তের বিধি-বিধান কেবল আল্লাহ করবেন। সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা যেমন আল্লাহ, দিন অবতীর্ণকারীয় তিনি।

কর্ম; আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ-নিষেধ মেনে চলা। ইসলামের রীতিনীতি মেনে চলা।| ইসলামের বিধি বিধান শুধু হালাল-হারামে বিশ্বাস করা এবং শরীয়াতের আদেশ-নিষেধ মেনে চলার মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং বাস্তবায়ন এর অংশ। এখানে এসেই মুসলিমদের মাঝে বড় পার্থক্য সৃষ্টি হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহর আদেশ-নিষেধ যত বেশি মেনে চলে, তার সীমারেখা যত বেশি অনুসরণ করে, সে তত বেশি আল্লাহর বিধানের অনুগত। তবে মৌলিকভাবে আল্লাহর আনুগত্য সবার মাঝে থাকা আবশ্যক।

আইন প্রণয়ন; অর্থ পরিচালিত হবে আল্লাহর রীতিনীতি অনুযায়ী। শরীয়তেই মুসলিমদের রক্ত, টাকা পয়সা, অধিকার ও দায়িত্বের মাঝে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দিবে। শরীয়তের হুকুম বাস্তবায়ন বা শরীয়তের কর্তৃত্ব বলতে সাধারণত এটাই বোঝায়। কারণ এ যুগে এসে মানুষের মাঝে এটি নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। এক্ষেত্রে মূল কথা হলো, মানুষ যে আইন প্রণয়ন করবে তা ওহীর অনুগামী হতে হবে।

শরীয়তের কর্তৃত্ব এ সকল ক্ষেত্রকে ব্যাপ্ত করে। বিশ্বাস বা আকিদা, বাস্তব জীবন, আইন সবকিছুই এর অন্তর্ভুক্ত। তবে বর্তমান যুগে এসে বিষয়টি আইন প্রণয়নের সাথে নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে। কারণ ইসলামী বিশ্বের সর্বত্র লোকজন ইসলামী আইন অনুসরণ ছেড়ে দিয়ে মানব রচিত আইন অনুসরণ শুরু করেছে। তাই শরীয়ত বাস্তবায়ন বলতে স্বাভাবিকভাবে এটিই উদ্দেশ্য।

আইন প্রণয়নের বিষয়টি যেহেতু সামাজিক জীবনকে ব্যক্ত করে, সেহেতু এটিকে সেকুলারিজম নাকোচ করেছে | কিন্তু বিশ্বাস আনা বা নিজের কর্মে প্রকাশ করা ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমিত | তাই এর সাথে সেকুলারিজমের কোন সংঘাত হবে না |

তবে এগুলোর মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান | বিশ্বাস করলে তা কর্মে প্রকাশ পাবে | আর কর্মে প্রকাশ পেলে সেটি বিধিবিধান হিসেবে প্রণীত হবেই | শরীয়াতে এমন কোন কথা নেই যে, কোন কিছু বিশ্বাস করা বা কাজে প্রকাশ করা ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমিত, সামাজিক পর্যায়ে তার প্রভাব নেই অথবা ব্যক্তিগত পর্যায়ের সাথে খাস, সামাজিক পর্যায়ে তার ব্যাক্তি থাকবে না |

সুতরাং একজন মুসলিমের করণীয় হলো অশ্লীলতাকে হারাম বলে বিশ্বাস করা | পাশাপাশি অশ্লীলতা থেকে নিষেধ করা এবং কেউ এমন কাজ করলে শাস্তি দেয়ার আইনেও বিশ্বাস করা | এছাড়া তাকে অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে এই নির্দেশনা মেনে চলতে হবে | তাকে অশ্লীলতার বিরোধীতাএবং অশ্লীলতাই অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদানের বিষয়টিও মানতে হবে | বিশ্বাস ব্যক্তি ও সমাজের সাথে জড়িত শারীই বিধি-বিধানের সাথে সংশ্লিষ্ট | আর বাস্তবায়নের বিষয়টিও ব্যক্তি বা সামাজিক পর্যায়ের বিধি-বিধানের সাথে সম্পৃক্ত | শরীয়তের কোন বিষয় সমাজ বাদে কেবল ব্যক্তির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হতে পারে এমনটা ভাবা যায় না | কিন্তু সেকুলার দর্শনের প্রভাবে কিছু মুসলিম এমনটাই ভাবতে শুরু করেছে | কেননা সেকুলার দর্শন

বিভিন্ন বিশ্বাস ও নিয়ম-নীতির ব্যাপারে উদারতা প্রদর্শন করে যতক্ষণ সেটি ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ থাকে এবং সামাজিক জীবনে অনুপ্রবেশ না করে |

শরীয়তের বিধিবিধানের প্রতি আত্মসমর্পণ এবং সেগুলো বাস্তবায়নের আবশ্যকতার পক্ষে অনেক শরীয়াতের দলিল বিদ্যমান | এটা একটা অকাট্য মূলনীতি | যার উপর মুসলিমরা সবাই একমত | মুসলিমদের মাঝে মতভেদ হয়নি এতটুকুই বলবো না, বরং বলব যে, মুসলিমদের ইতিহাসে কখনো এটি অস্বীকার করার কথা ভাবনাতেও আসেনি | কারণ শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি মেনে নেওয়াটা স্বতঃসিদ্ধ | এর পক্ষে অসংখ্য দলিল বিদ্যমান |

প্রথমত শরীয়তের বিচার মানার আবশ্যকতা:

এর পক্ষে কোরআনের অনেক আয়াত আছে | আল্লাহ তার শরীয়ত অনুসরণের নির্দেশ দিয়ে বলেন, " আর তাদের মাঝে আল্লাহর অবতীর্ণ বিষয় দিয়ে ক বিচার করুন, আপনি আপনার প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না | তাদের থেকে সাবধান থাকুন যাতে তারা আপনার উপর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার কোন কিছু থেকে বিচ্যুত করতে না পারে { সূরা আল মায়দা;}

"অতএব আল্লাহর অবতীর্ণ বিষয় দিয়ে আপনি তাদের মাঝে ফায়সালা করুন আপনার কাছে যে হক এসেছে তা থেকে সরে গিয়ে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না{ সূরা আল মায়েদা}

আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন, " আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা দাবি করে তারা আপনার উপর অবতীর্ণ এবং আপনার উপর পূর্ববর্তীদের উপর অবতীর্ণ বিষয়ের উপর ঈমান এনেছে | তারা চায় তাগুতের কাছে বিচার করতে, অথচ তারা আদিষ্ট হয়েছে তাগুতের কুফরি করার ব্যাপারে| {সূরা আন নিসা}

যিনি শরীয়তের বিধান ছাড়া অন্য বিধানের অন্বেষণ করেন তাদের নিন্দা করে আল্লাহ বলেন, " তারা কি জাহেলিয়াতের বিধান চায়? দৃঢ়বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ থেকে উত্তম কোন বিচারক আছে কি?" { সূরা আল মায়েদা}

যারা আল্লাহর রাসূলকে বিচারক মানেনা তাদেরকে ঈমানহীন ঘোষণা করে আল্লাহ বলেন, “ না, আপনার রবের কসম! তারা ততক্ষণ ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যকার মতভেদের বিষয়ে আপনাকে বিচারক না বানায় | {সূরা আন নিসা}

আল্লাহর বিধান অনুযায়ী যারা বিচার করে না তাদের ক্ষেত্রে কুফরি, জুলুম ও ফুসুখের হুকুম দেয়, আর আল্লাহর অবতীর্ণ বিষয় ছাড়া যারা বিচার করেনা, তারা কাফের { সূরা আল মায়েদা}

যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলের মত করে কারো আনুগত্য করে, সে যেন তাকে রব হিসাবে গ্রহণ করল | “ তারা আল্লাহ ছাড়া তাদের পণ্ডিত ও সংসার বিরাগীদেরকে তাদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে |”{ সূরা আত তাওবা}

আল্লাহ ও তার রাসুলের সিদ্ধান্তের বিপরীতে কোন মুসলিমের সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ার আর থাকবে না | “ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন ফয়সালা দিলে কোন মুমিন নর নারীর জন্য বাছাই করার এক্তিয়ার নেই|”{সূরা আল আহযাব}

এ সকল অকাট্য কোরানে দলিল প্রমাণ করে যে, ইসলামের বিধি-বিধান অনুযায়ী বিচার পরিচালনা করা মুসলিমদের ওপর ওয়াজিব| কোন মুসলিম কল্পনাও করতে পারে না যে, ব্যভিচার হালাল যেখানে আল্লাহ সেটি হারাম করেছেন | সে কখনো ভাবতে পারেনা যে শরীয়ত ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা বিচার হতে পারে | এসব কিছু শরীয়তের বিধিবিধান |

যিনি ব্যভিচার হারাম করেছেন, তিনিই শারীই দন্ড আবশ্যক করেছেন | সুতরাং কিভাবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে ব্যভিচার বৈধ মনে করা হতে পারে? তাকে শাস্তি না দিয়ে থাকা যেতে পারে? অথচ দুইটাই শরীয়তের বিধান | এগুলো আসলে কিছুই না, কেবলই সেকুলারিজমের প্রভাব |

সারিয়াতের বিধি-বিধান আবশ্যক করন:

কোরআন সুন্নাহর অসংখ্য দলিল প্রমাণ থেকে একজন মুসলিম বুঝতে পারে যে, শরীয়তের বিধি বিধান বাধ্যতামূলক হওয়াটা অকাট্য মূলনীতি

বিচারের বিধি-বিধান:

বিচার কার্য শরীয়তের প্রসিদ্ধ দায়িত্ব এর পক্ষে কোরআন সুন্নাহর দলিল বিদ্যমান | নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার পরবর্তী খলিফারা এ দায়িত্ব পালন করেছেন | বিচার কার্য বলতে বোঝানো হয় বিবাদমান গোষ্ঠীর মাঝে মীমাংসা করা

এবং তাদের ওপর বিধি-বিধানের আবশ্যকতা আরোপ করা অর্থাৎ শরীয়তের বিধি-বিধান নিছক ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়, যার কোন আইনগত প্রয়োগ নেই |

সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ:

এর অর্থ হল সৎ কাজের আদেশ দেওয়া এবং অসৎ কাজ করতে নিষেধ করা | বিষয়টি নিছক সৎ কাজ অসৎ কাজে মাঝে সীমাবদ্ধ নয়| বরং আদেশ-নিষেধ করা উদ্দেশ্য| সুতরাং শরীয়তের বিধি-বিধান ব্যক্তি ও সমাজ উভয় পর্যায়ে বাস্তবায়িত হবে |

## শরীয়াতের দণ্ড সমূহ:

যেমন; ব্যাভিচার, মদ্যপান, অপবাদ, চুরি ইত্যাদির জন্য শাস্তি প্রয়োগ | এর দাবি হলো, শরীয়তের বিধি বিধান বাস্তবায়নের আবশ্যকতা এবং ব্যক্তি ও সমাজে এর কার্যকারিতা থাকা | অর্থাৎ ব্যক্তি কেবল হারাম ত্যাগ এবং ওয়াজিব পালনের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং যে এর বিরোধিতা করবে তার ওপর শাস্তি প্রয়োগ করবে|

আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার পরবর্তী খলিফারা জিহাদ করে অনেক অঞ্চল দখল করেছেন | পূর্ব-পশ্চিমের বহু স্থানে তারা ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন | জিহাদের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর কালিমা উড্ডন করা এবং ইসলাম অনুযায়ী শাসন কার্য পরিচালনা করা | এর থেকে বোঝা যায় যে, শরীয়তের বিধি বিধান বাস্তবায়ন করা আবশ্যক, তা কেবল ব্যক্তিগত বিশ্বাসের সীমাবদ্ধ নয়|

মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের সাথে জড়িত শরীয়তের বিস্তারিত বিধানসমূহ:

শরীয়তের বহু শাখা প্রশাখা আছে যেগুলো সীমাবদ্ধ নয়| সেগুলো মানুষের মধ্যকার সম্পর্কের সাথে জড়িত যেমন: বিবাহ, মিরাস, মুয়ামালাত, অপরাধ ইত্যাদি| এগুলো ব্যক্তি পর্যায়ে সীমাবদ্ধ বিধি-বিধান নয়| এগুলো বাস্তবায়নের একটাই উপায় আর সেটা হল শরীয়তের বিধি বিধান সবার ওপর প্রযোজ্য হওয়া|

এ সকল বিধান বেশ কিছু ক্ষেত্রে সাথে জড়িত হওয়ায় কেবল ব্যক্তিগত পর্যায়ে বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব নয় | ইবাদতের মত একজন ব্যক্তির ইচ্ছার সাথে বিষয়টি

নির্দিষ্ট নয় | বরং অবশ্যই এখানে একটা ‘ আবশ্যক করা’র দিক থাকবে | এর থেকে বোঝা যায় যে, এ সকল সরই বিধি-বিধান মানার ক্ষেত্রে আবশ্যক করার একটা দিক আছে |

এই মূলনীতিগুলো যদি আমরা লক্ষ্য করি তবে, শরীয়াতের বিচার মানার আবশ্যকতা, শরীয়তের বিধি-বিধান বাধ্যতামূলক করন, বিভিন্ন ক্ষেত্রের সাথে জড়িত শরীয়াতের বিধি-বিধান তাহলে আমরা বুঝবো যে, বিধিবিধান অনুযায়ী বিচার করা একটা অকাট্য মূলনীতি যেটা ছাড়া ইসলাম বোঝা সম্ভব নয় |
তাই মুসলিমদের মাঝে এ বিষয়ে ইজমা সংঘটিত হয়েছে | এমনকি এটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয় পরিণত হয়েছে যা নিয়ে কোনো প্রকার সংশয় আসে না | তারপরও এ বিষয়টি নতুন করে উত্থাপিত হয়েছে এবং স্মরণ করানোর প্রয়োজন দেখা দিয়েছে পরবর্তী যুগের সেকুলারিজমের প্রভাবের কারণে |

শরীয়াতের কর্তৃত্ব একটা গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি এই কর্তৃত্ব লঙ্ঘিত হয় এমন বেশ কিছু বিষয় আছে। শরীয়তের কর্তৃত্বের সাথে যেটা যত সাংঘর্ষিক, সেটি তত বেশি শরীয়তকে লংঘন করে। যেমন; এই বিশ্বাস রাখা যে, শরীয়ত আবশ্যকীয় কোন বিধান প্রণয়ন করেনি। এটি হালাল কে হারাম এবং হারামকে হালাল বলার নামান্তর মাত্র। এ যেন দিনের আবশ্যকীয় বিষয় নাকচ করা।
দ্বিতীয়তঃ এই বিশ্বাস রাখা যে, শরীয়তের বিধান বাধ্যতামূলক নয়। অর্থাৎ শরীয়তের বিধি-বিধান মানতে হবে কিন্তু সবার উপর সেটি চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। এটিও আগের দিনের মতোই দিনের আবশ্যকীয় বিষয়কে নাকচ করার মত।
তৃতীয়ত এই বিশ্বাস রাখা যে, শরীয়ত এ যুগে আবশ্যক নয়। কারণ শরীয়ত আবশ্যকতার বিষয়টি ঐতিহাসিক বিষয়। এখন আর সেটা প্রযোজ্য নয়। এটিও অকাট্য বিষয় অস্বীকার করার মত।

শরীয়তের সাথে আংশিক বা পুরোপুরি সাংঘর্ষিক মানব রচিত আইন দিয়ে বিচারকার্য পরিচালনা:

শরীয়তের অকাট্য বিধিবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক আইন প্রবর্তন করা শরীয়তের বিচার লঙ্ঘন করার শামিল কারণ মুসলিমদের দায়িত্ব হল কোরআন সুন্নাহর বিধানের কাছে সমর্পণ করা | শরীয়ত কর্তৃত্ব তখনই সবচেয়ে বেশি লঙ্ঘিত হয় যখন ইসলামের বিধি-বিধানের বদলে শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক আইন দিয়ে বিচার সম্পাদন করা হয় | এটি হতে পারে পুরোপুরি, অর্থাৎ সকল আইনের ক্ষেত্রে শরীয়ত ছাড়া ভিন্ন উৎসের উপর নির্ভর করা অথবা হতে পারে আংশিক, অর্থাৎ কিছু ক্ষেত্রে ভিন্ন উৎসের বিচার মেনে চলা |

আমরা যখন কোন আইনের ক্ষেত্রে বলি সেটি শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক, তখন আমরা বোঝাতে চাই শরীয়তের অকাট্য বিধানের সাথে তা বিরোধপূর্ণ। যেমন; বিভিন্ন অশ্লীলতা ও মদের বৈধতা প্রদান, শরীয়তের দণ্ড ( হদ) বাতিল করা, শরীয়তের অকাট্য ওয়াজিব বাদ দেওয়া। শরীয়তের আইন অর্থ এমন না যে, শরীয়ত যে সকল বিষয়কে বিবেচনায় নিয়েছে শুধু সেগুলো শরীয়ত আইনের অন্তর্ভুক্ত হবে। বরং শরীয়ত যা নাকচ করেনি তাও শরীয়তে বৈধ। এদিক থেকে আইনের ক্ষেত্রে বিস্তৃত। শরীয়ত যা কিছু নাকচ করেনি, তা সবই তার দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য। শরীয়ত যে সকল মাসআলা বা কল্যাণ খোঁজ করেনি, সেগুলো সব ইসলামে বৈধ।

শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক বিভিন্ন মতবাদ গ্রহণ করে নেওয়া:

শরীয়তের দ্বারা বিচারের আবশ্যকতাকে নাকচ করে এমন বিভিন্ন মূলনীতি গ্রহণ করা। এর মাধ্যমে ব্যক্তির মনে শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক বিভিন্ন মতবাদ অনুপ্রবেশ ঘটায়। যেমন, যদি কেউ মনে করে ব্যক্তি স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে যদিও তা শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক হয়। অথবা মনে করে রাষ্ট্রের দায়িত্ব দুনিয়াবী বিষয়গুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করা, দ্বীনি কোন দায়িত্ব রাষ্ট্রের নেই ইত্যাদি। শরীয়তের অকাট্য বিধিবিধানের সাথে কতটা স্পষ্টভাবে সাংঘর্ষিক, তার আলোকে সেগুলোর স্তরবিন্যাস হয়ে থাকে।

# শরীয়তের কর্তৃত্ব সম্পর্কে আধুনিক তর্কবিতর্কের বাস্তব অবস্থা অনুধাবনের  কয়েকটি মূলনীতি:

বর্তমান যুগে শরীয়তের কর্তৃত্ব নিয়ে তর্কবিতর্কের মাত্রা অনেক বেশি। এই মূলনীতিকে কেন্দ্র করে রয়েছে নানামুখী প্রশ্ন আপত্তি সংশয়। তবে কিছু মূলনীতি অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। এই মূলনীতিগুলো একজন মুসলিমকে চলমান সংঘাত বুঝতে সাহায্য করবে। উত্থাপিত নতুন সব সংশয় প্রতিহত করতে ভূমিকা রাখবে।

প্রথম মূলনীতি:  শরীয়তে কর্তৃত্ব ইসলামের অন্যতম একটা মূলনীতি। এটি আল্লাহর দিনের অকাট্য বিধান। এ সংক্রান্ত তর্ক-বিতর্ক কোন ব্যক্তি,  গোষ্ঠী বা দলের সাথে নির্দিষ্ট নয়। এটা একটা স্পষ্ট শরীয়তের মূলনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট।

দ্বিতীয় মূল নীতি:   শরীয়তের আইন দিয়ে বিচার করা একটা অকাট্য মূলনীতির সাথে সম্পৃক্ত। কখনো এটা নিয়ে মুসলিমদের মাঝে মতভেদ ছিল না এটি তাদের মাঝে স্বতঃসিদ্ধ বিষয় ছিল। এমন কোন ইজতেহাদী বিষয় ছিল না যেটা নিয়ে ফকিরগণ মতভেদ করেছেন কিংবা ছোট  পরিমানে হলেও  ভিন্নমত ছিল।  এমনকি এটি এমন ইজমার মাসআলা যা নিয়ে সংশয় নেই,  এটি অকাট্যভাবে সাব্যস্ত মূলনীতি।

তৃতীয় মূলনীতি:   ইসলামের ইতিহাস জুড়ে সব সময় শরীয়ত অনুযায়ী শাসন কার্য পরিচালিত হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়কাল থেকে খিলাফায় রাশেদিন পর্যন্ত সবসময় এমনটা ছিল। শরীয়তের আইন অনুযায়ী শাসনব্যবস্থা চলমান থাকবে।

ইসলামের ইতিহাসে যত জুলুম, ফেতনা,  দ্বন্দ্ব ও ব্যর্থতা ছিল, সবকিছুর পরও কখনো শরীয়তের বিধান অনুযায়ী বিচার করা থেকে কেউ সরে আসেনি। ভিন্ন কোন উৎসকে  কেউ গ্রহণ করেনি। এটি উপনিবেশ যুগের পর মুসলিম সমাজের ঘটে যাওয়া একটি নতুন ঘটনা।

অতএব শরীয়তের বিধান আকড়ে ধরতে বলার অর্থ মূলকে ধারণ করতে বলা এবং মুসলিম সমাজের আত্মপরিচয় সংরক্ষণ করা। ইসলামের লম্বা ইতিহাস জুড়ে এটা বিস্তৃত। আর সেকুলারিজম নতুন গজিয়ে ওঠা আগাছা।  মুসলিমকে  সচেতন থাকতে হবে  যাতে কেউ শরীয়তকে খারাপ ভাবে উপস্থাপন না করে। শরীয়তের আইন ফিরিয়ে আনতে বলা কে যেন সীমালংঘন মনে না করা হয়। শরীয়তের বাস্তবতাকে যেন  কঠিন

ও ও অস্পষ্ট করে তুলে ধরা না হয়। কারণ এমনটা করা শরিয়াত ঐতিহাসিক ও সামাজিক বাস্তবতাকে উল্টে দেওয়ার নামান্তর।

চতুর্থ মূল নীতি: একজন মুসলিম এ বিষয়টি নিয়ে যত মতভেদ ও বিচ্যুতি দেখতে পায় সবকিছুর কারণ হলো সেকুলারিজমকে গ্রহণ করা। এই উম্মার দ্বীনের সাথে সাংঘর্ষিক হয় এমন আইনের আশ্রয় নেওয়ায় এত মতবিরোধের কারণ। সেকুলার আইনি মুসলিমদের মাঝে সংঘাত আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। আর এই দ্বন্দ্ব-বিভক্তি ততদিন স্থায়ী হবে, যতদিন শরীয়ত ছাড়া অন্য কোন কিছুর অধীনে শাসন বলবৎ থাকবে মুসলিমদেরকে ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুর ওপর একতাবদ্ধ করা যাবে না। মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ করার ব্যাপারে সত্যনিষ্ঠ প্রত্যেকটা মানুষকে ইসলামের গ্রহণযোগ্য নীতিসমূহের খোঁজ করতে হবে নতুবা সে মরিচিকার মাঝে ঘোরাফেরা করছে বলে গণ্য হবে।

পঞ্চম মূলনীতি: বিভিন্ন সময় ও স্থানে শরীয়ত বাস্তবায়ন নানা কারণে সম্ভব নাও হতে পারে যেমন একজন মুসলিম শরীয়তের কিছু বিধি-বিধান বাস্তবায়নে অক্ষম হতে পারে। কিন্তু এ বাস্তবতা যেন শরীয়ত বাস্তবায়নের আবশ্যকতার ব্যাপারে মুসলিমের আকিদাকে বদলে না দিতে পারে।

ষষ্ঠ মূলনীতি: বর্তমান যুগে ইসলামের শাসনের ব্যাপারে বেশি পরিমাণ সংশয় ও মতপার্থক্যের অর্থ এটি নয় যে, এই মূলনীতি অস্পষ্ট বা এটি নিয়ে সংশয় ও বিভ্রাট আছে। কোন কিছুর ব্যাপারে বেশি পরিমাণ আপত্তি কখনো সেটিকে সংশয়ের বিষয়ে পরিণত করে না বরং আইনের বিভিন্ন প্রভাব বিষয় থাকতে পারে।আমাদের যুগে সে সকল বাহ্যিক প্রভাবক বিষয়গুলো কাজ করে চলছে। এগুলোর সংখ্যা অনেক। ফলে মুসলিমদের মাঝে সংশয় সন্দেহ আরো বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু তাই বলে ইসলামী শাসনের আবশ্যকতায় কোন সংশয় আছে সেটি যেন কোন মুসলিম না ভাবে।

পুঁজিবাদ কি?

ধনতন্ত্র, পুঁজিবাদ। সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। ষোড়শ শতকে ইউরোপের কয়েকটি দেশে এই নতুন সমাজব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে। নতুন উৎপাদনী যন্ত্রের মালিক এখানে সমাজের প্রভু, আগে যেখানে ছিল জমিদার বা সামন্ত। যন্ত্রের মালিক নির্দিষ্ট মজুরিতে যন্ত্রহীন মানুষকে দিয়ে তার যন্ত্র চালায়, বেশি থেকে বেশি পণ্য উৎপাদন করে, সেটা দেশ-বিদেশে বিক্রি করে আরো যন্ত্র কেনে, আরো শ্রমিক লাগিয়ে আরো পণ্য বানায়।

এভাবে চলতে থাকে। এ এক নতুন সমাজ, নতুন ব্যবস্থা। মুনাফা অর্জনের প্রতিযোগিতা।

সাম্রাজ্যবাদ কি?

এক রাষ্ট্র কর্তৃক আরেক রাষ্ট্রের ওপর শক্তি ক্ষমতা প্রয়োগ করা ; তা হতে পারে নিজের দেশের লোকবল সেটেল করে (colonialism), সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ করে বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। কলনিয়ালিসম বা উপনিবেশবাদের আবার স্থায়ী বসতি গড়ে তোলার ব্যাপার রয়েছে। যেমন আমেরিকায় ব্রিটেন করেছে। এই অর্থে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও দুটোর উদ্দেশ্যের মাঝে কোন পার্থক্য নেই —- কোন এলাকা জয় করে অর্থনৈতিক ও কৌশলগতভাবে উপকৃত হওয়া। যেমন : ব্রিটেন ভারতীয় উপমহাদেশ শাসন করেছে ১৯০ বছর। এখনো পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা যে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে নানা ভাবে, যাকে বলা হয় নব্য সাম্রাজ্যবাদ।

শিল্প বিপ্লব:

আগে সমাজ ছিল মূলত কৃষিজীবী ও কুটির শিল্প ভিত্তিক। ১৭৫০১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইউরোপে যন্ত্র শিল্প বিকশিত হয়, জেমস ওয়াটের বাষ্প ইঞ্জিন। আগের কৃষিজীবী ও হস্তশিল্পের স্থান ইন্ডিয়ান চালিত বৃহৎ শিল্প, একেই বলে শিল্প বিপ্লব( ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশন)। যা ইংল্যান্ডের শুরু হয়ে পড়ে সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে।

বিশ্বায়ন বা Globalization:

পুরো বিশ্বকে একটা অবাধ প্লাটফর্মে পরিণত করা যাকে বলা হবে global village যেখানে —-

*অর্থনৈতিক বিষয়ে উদারনীতি গ্রহণ করা হবে যাতে প্রথম বিশ্ব সহজে তৃতীয় বিশ্বের মার্কেটে নিজের পণ্য বিক্রি করতে পারে কম মূল্যে শ্রম ও কাঁচামাল নিতে পারে। শুল্ক ট্যাক্স ইত্যাদির বাধা থাকবে না।

*রাষ্ট্র অর্থ সংস্কৃতিতে পশ্চিমা দাস গ্রহণ করা হবে কারণ এই সিস্টেমে পুঁজিবাদের জন্য অনুকূল।

*আন্তর্জাতিক উদার আইন মেনে রাজনৈতিক ব্যবস্থা তৈরি যেখানে আমেরিকার নেতৃত্বে সব চলবে।

*তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়ন যা ওপরের তিনটা পয়েন্টকে আরো গতিশীল করবে। তৃতীয় বিশ্বকে প্রথম বিশ্বের ওপর পুরো নির্ভরশীল ও নখদর্পণে নিয়ে আসবে।

মুক্তবাজার অর্থনীতি:

মুক্তবাজার অর্থনীতি বাজারের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ হয় থাকবে না বা সীমিত থাকবে। ট্যাক্স, মান নিয়ন্ত্রণ, কোটা, টারিফ বা অন্যান্য সরকারি হস্তক্ষেপ থাকবে না [Encyclopedia Britannica] ফলে প্রথম বিশ্বের বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি তাদের পণ্য দেদারসে দ্বিতীয় বিশ্বে প্রবেশ করাবে যাবে। অন্যদিকে প্রতিযোগিতা টিকতে না পেরে আত্মবিশ্বের নিজের শিল্প ধ্বংস হয়ে যাবে। একচেটিয়া কি প্রতিষ্ঠা হবে গরিব দেশ আরো গরিব হবে আরো ধনী হবে।

ভোগবাদ বা consumerism:

১৯৭০ সাল থেকে ভোগবাদ শব্দটি 'বেশি বেশি পণ্য ও সেবা গ্রহণ' অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। একে 'অর্থনৈতিক বস্তুবাদ' ও বলা হয় যার মানে, বেশির চেয়ে বেশি পার্থিব বস্তু আহরণ ও ভোগের মানসিকতা তবে সেটিং এর পরিভাষায় এর অন্য অর্থ রয়েছে।

বস্তুবাদ বা Materialism:

বস্তুবাদ বিশ্বের প্রতিটি বিষয়কে দার্শনিকেরা দুই ভাগে ভাগ করে থাকেন ভাববাদ। বস্তুবাজ হল এই ধারণা যে বস্তু এবং ভাব এর মধ্যে বস তুই প্রধান মন এটা হল অপ্রধান বিশ্ব হলো বস্তু। চেতনা বা মন বস্তুরই বিবর্তনের ফলে সৃষ্ট, আলাদা কিছু নয়।

এরই অনুসিদ্ধান্ত হলো বিশ্ব অসীম। আগে থেকেই ছিল। কেউ একে সৃষ্টি করেনি। ঈশ্বর বা কোন বহি:শক্তি এর স্রষ্টা নয়।

Encyclopaedia America ২৪ নং volume এ সেকুলারিজম এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ প্রদান করা হয়েছে:

১) secularism is an ethical system founded on the principles of natural morality and independent of revealed religion or super naturalism.

সেকুলারিজম একটি নৈতিক ব্যবস্থা যাকে বল প্রাকৃতিক নৈতিকতার মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং ঐশী সূত্রে প্রাপ্ত বা রহস্যবাদমুক্ত।

২) Holyoake যিনি সেকুলারিজম নামকরণের প্রথম উদ্যোক্তা এবং যিনি সেকুলার সোসাইটি গঠন করে এর পক্ষে প্রথম আন্দোলন শুরু করেন তার লিখিত A Confession of Belief বইতে যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে :
A form of opinion which concerns itself only with the questions, the issues of which can be tested by the experience of this life.
৩) সেকুলারিজম হল এক ধরনের মতামত যা ইহজগতে জীবনের অভিজ্ঞতায় পরীক্ষা সম্ভব বিষয়গুলোকে স্পর্শ করে।
সেকুলারিজম এমন একটি মতবাদ যে মতবাদে মানবজাতির ইহজগতের কল্যাণ চিন্তার ওপর গড়ে উঠবে এমন এক নৈতিক ব্যবস্থা যেখানে থাকবে না কোন ধরনের আল্লাহ ও পরকাল বিশ্বাসভিত্তিক বিবেচনা।
৪) সেকুলারিজম এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে সাধারণ শিক্ষা ও সামাজিক সংস্থা পরিচালনায় কোন ধরনের ধর্মীয় উপাদান অন্তর্ভুক্ত হবে না।
সেকুলারিজম এমন একটি মতবাদ যা ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিকভাবে পবিত্র বলে বিবেচিত হয়। এখানে কোনভাবেই ধর্মের সাথে কোন সম্পর্ক থাকে না আইন-কানুন ব্যবস্থা।
ইহজাগতিক অথবা পার্থিব ধর্মীয় কিংবা আধ্যাত্মিক নয়, এটিই বস্তুবাদ সেকুলারিজম।
Wikipedia তে সেক্যুলারিজম এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে সেকুলারিজমের জ্ঞান হলো সেই জ্ঞান যার ভিত্তি রয়েছে এই জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ জগতের কল্যাণ সাধন করে, যা এ জগতের অভিজ্ঞতায় পরীক্ষা করা সম্ভব।
সমাজ সংগঠন, শিক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে ধর্ম সংশ্লিষ্ট হতে পারবে না। এমন বিশ্বাসের নাম হলো সেকুলারিজম।
পশ্চিমা বিশ্ব মনে মানব কল্যাণ নিহিত হবে যুক্তির মাধ্যমে। ওহি বা ধর্মের নির্দেশনার মাধ্যমে নয়। আর যুক্তি পরীক্ষিত হবে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে।
secular একটি ইংরেজি ভাষার শব্দ। এ শব্দটি ল্যাটিন ভাষার Saeculum শব্দের অর্থ হলো ইহজগত। পরিভাষাগতভাবে এর অর্থ দাঁড়ায় ইহজগৎ বর্তমান দুনিয়া ও ইহজীবন সম্পর্কিত বিষয়াদি।
সেকুলারিজম এমন এক সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শন যা মানবজাতি ইহজাগতি কল্যাণ চিন্তার ওপর গড়ে উঠেছে। এর আওতাধীন বিষয়গুলো ওদের অভিজ্ঞতায় করা সম্ভব। মানব রচিত এ মতবাদ ইহ জগতের বাইরে পরজগৎ নিয়ে মাথা ঘামায় না। এ মতবাদ ওহীর মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞানকে অস্বীকার করে ধর্মকে অস্পষ্ট, অপূর্ন, অনির্ভরযোগ্য

ও অবিশ্বাস্য বলে মনে করে। এ মতাদর্শ মানুষের সামন্তিক ব্যাপার ও শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মকে কোনভাবে সংশ্লিষ্ট করতে রাজি নয়।

## বিপর্যস্ত মানবতা :

মানুষ আজ একবিংশ শতাব্দীতে উপনীত। আজ একটা ছোট পল্লীতে পরিণত হয়েছে। মানুষ ধারণা গতি বৃদ্ধি করেছে। সে আজ পৃথিবীর দূরবর্তী স্থানের মানুষের সাথে ঠিক একই ভাবে কথা বলতে পারছে, যেভাবে সে তার পাশের লোকের সাথে আলাপ করে। মানুষ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। আজ আজ প্রতিযোগিতা চলছে কার আগে কে চাঁদ কিংবা মঙ্গল গ্রহে নির্মাণ করবে আর প্রমথ ভ্রমণে যাওয়ার ব্যবস্থা করবে। সম্ভবত মাটির অভ্যন্তরে এমন কোন সম্পদ নেই যা সে তুলে আনতে সক্ষম হয়নি। ধারনা করা হয়, সে উন্নতির চরম শিখরে পৌছে গেছে।

তারপরও মানবতা আজ বিপর্যস্ত। মানুষ সামষ্টিক অর্থে কি সুখ ও শান্তিতে আছে? এর জবাব ইতিবাচক না হয়ে নেতিবাচক হওয়ায় স্বাভাবিক।

আজও সেই বৃদ্ধের আহাজারি শোনা যায় যে তার সকল শক্তি সামর্থ্য ও মেধা উজাড় করে দিয়ে এখন অসহায়। তার ছেলেমেয়েদের ছবি মিডিয়াতে সে দেখে, তাদের গলার আওয়াজও ইথারে ভেসে আসে। কিন্তু তাদের সময়ের এত অভাব তাদের পক্ষ থেকে একটি হ্যালো শুনবার সুযোগ ও তার হয় না শোনা যায় সেই বৃদ্ধের ক্রন্দন ঘোষিত তারুণ্য আঙিনায় ভিড় লেগেই থাকতো কত ভ্রমরের গুঞ্জোরণ সে শুনতো অথচ আজ তার দিকে ফিরে তাকাবার কেউ নেই। শোনা যায় ক্রন্দন সেই কোটিপতির যাকে সাময়িক সময় দেয়ার জন্য অনেকেই প্রতিযোগিতা করে। কিন্তু তার অন্তরের অন্ত:স্থলের বেদনা গুলো উপলব্ধি করার কারো সময় নেই, কারো ধৈর্য নেই, কারো হৃদয় নেই। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতে দেখা যায় সেই শ্রমিককে, যে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে সোনা কিংবা হীরা অতল তল থেকে আহরণ করে। তার হাতে সামান্য কয়েকটি মুদ্রা তুলে দিয়ে বিদেশীরা তার জন্মভূমির মূল্যবান সম্পদ লুট করে নিয়ে যায়। শোনা যায় সেই যুবকের আর্তনাদ যার দিকে তাক করে আছে বিদেশি সৈন্যদের বন্দুকের নল যাদের ইচ্ছার বাইরে নাড়াচাড়া করলে খোয়াতে হবে জীবন। শোনা যায় কুপিয়ে ফুপিয়ে ক্রন্দনরত সেই সৈনিকের কান্না, যাকে গুলি করতে আদেশ দেয়া হয়েছে। সে বুঝে গুলি করার পরিণতি কি, যার ওপর গুলি আঘাত করবে তার নিজের

ও আত্মীয় স্বজনের কি অবস্থা হবে। কিন্তু সে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না, যে গুলি করবে তার কি অপরাধ? বিলাপ শোনা যায় শিশু সদনের সেই অসহায় শিশুর যে শিশু জানে না কে সে? কে তার মা? কে তার বাবা? কিভাবে সে পৃথিবীতে এলো? কোথায় সে যাবে? কি হবে তার ভবিষ্যতে? শোনা যায় সেই মুমূর্ষু রোগীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস। এগুলো কার কাছে নিবেদন করবে আজ এ পরিণত বয়সে? তার পক্ষে নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না।

আরো কত কান্না, কত বিলাপ, কত দীর্ঘ শ্বাস এখানে ভেসে বেড়ায়– শোনার ইচ্ছা থাকলে কান পেতে তা শোনা যায়, উপলব্ধি করার মন থাকলে মর্মে মর্মে তার সুর অনূরণিত হয়।

এবার বিপর্যস্ত মানবতার কারণ চিহ্নিত করে কিছু উদ্ধৃতি পেশ করা হলো। যাদের উদ্ধৃতি পেশ করা হচ্ছে তারা বিশ্ব পরিচিত, বিশ্ববিখ্যাত।

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ফরাসি কলার ডাক্তার এলেক্সিস ক্যারল তার Man the Unknown গ্রন্থে বলেন :

'প্রতিটি দেশের ক্ষমতাসীন শাসক শ্রেণীর মধ্যে, যাদের হাতে ক্ষমতার চাবিকাঠি রয়েছে, নৈতিক যোগ্যতার দৃশ্যমান অবনতি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আমরা অনুভব করছি, আধুনিক সভ্যতা সেসব বড় বড় আকাঙ্খা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে যা মানবতা তার প্রতি পোষণ করেছে এবং সে সমস্ত লোক জন্ম দিতে পারেনি যারা মেধা ও সাহসিকতার অধিকারী হবে এবং সভ্যতাকে কষ্টকর দূরাতিক্রম্য রাস্তায় নিরাপত্তা ও শান্তির সাথে নিয়ে যেতে পারবে যেখানে মানবতা আজও মুখ থুবড়ে পড়েছে। প্রাকৃতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পপ্রযুক্তি মানুষের জন্য যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছে তা মনুষ্য উপযোগী নয়, আবার সুপরিকল্পিতভাবেও স্থাপিত হয়নি।'

আমরা এক অব্যাহত নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অধঃপতনের সাথে জড়িত। যেসব জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে প্রযুক্তি প্রীতি বিকাশ লাভ করছে, উন্নতি লাভ করেছে তারা আগের তুলনায় খুবই দুর্বল এবং খুবই দ্রুততার সাথে ও বর্বরতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে কিন্তু তাদের এই অনুভূতি নেই। বস্তুবাদ সম্পর্কে যতটা জানি তার তুলনায় জীবনের জ্ঞান গভীর। এভাবে জীবন অতিবাহিত করা দরকার যেন আমরা খুব কমই জানি। আমাদের জ্ঞান এ সম্পর্কে খুবই পেছনে পড়ে রয়েছে। কম জানার কারণে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি।

আমাদের জন্য তো এটাই সমীচীন ছিল যে, আমরা নিজের দিকে অধিকতর মনোনিবেশ করি ও মনোযোগ দেই। যান্ত্রিক প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধ্য নেই সে আমাদের বুদ্ধিমত্তা দান করতে পারে, দান করতে পারে নৈতিক শৃঙ্খলা, চারিত্রিক বিধান, স্বাস্থ্য, স্নায়বিক ভারসাম্য, শান্তি ও নিরাপত্তা।

Guide to Modern Wickedness গ্রন্থে অধ্যাপক Joad বলেন:

"সমসাময়িক যুগে সমাজের বিশ্বাস ছিল। আরামপ্রিয়তার নামই হলো সভ্যতা। কিন্তু এ যুগের বিশ্বাস হল দ্রুততা ও গতির নাম সভ্যতা। গতি হল বর্তমানকালের যুবকদের আরাধ্য। এর মন্ডপ ও মন্দিরে তারা আরাম প্রশান্তি ও দয়ামায়া অত্যন্ত নির্দয়ভাবে বলি দেয়।

উড়োজাহাজ দেখুন যারা এটা আবিষ্কার করেছিল তাদের উচ্চ মনোবল, অটুট সংকল্প, ইচ্ছা শক্তি ও দুঃসাহস অত্যন্ত প্রশংসনীয় ছিল। কিন্তু এখন আপনি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পর্যালোচনা করুন যারা আওতাধীনে উড়োজাহাজ ব্যবহৃত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। সেসব উদ্দেশ্য দুঃখ কি? তা হল আকাশ থেকে বোমাবর্ষণ, মানব দেহ খন্ড-বিখন্ডকরণ, জীবিতদের জীবন হরণ, মানব দেহ ভষ্মিভূতকরণ, বিষাক্ত গ্যাস নিক্ষেপণ ও প্রতিরক্ষা অসমর্থ ও দুর্বল মানুষগুলোকে ধ্বংসকরণ।"

প্রখ্যাত সাংবাদিক ও দার্শনিক ধর্মান্তরিত মুসলমান (Leopold) Mohammed Asad তার Islam at the cross road বইতে লেখেন "ইউরোপের মানুষের একটা দল সৃষ্টি হয়ে গেছে, যাদের নীতিবোধ ও নৈতিকতা নিছক উপযোগ বাদের প্রশ্নের সীমাবদ্ধ। যাদের কাছে ভালো-মন্দ সর্বোচ্চ মাপকাঠি হচ্ছে একমাত্র বস্তুবাদী সাফল্য।'"

Man The Unknown গ্রন্থের আরেকটি উদ্ধৃতি, "এ কালের মতাদর্শ পূজারীরা মানবতার কল্যাণের জন্য নানাবিধ ভিত্তি স্থাপন করেছে। তারা মানুষের অসম্পূর্ণ ও কুৎসিত ছবি এঁকেছে। প্রতিটি ব্যাপারে পরিমাপের মানদন্ড হওয়া উচিত ছিল শুধু মানুষ। কারণ আমরা বিবেক ও নৈতিকতা উভয় দিক দিয়ে ক্ষয়িষ্ণু ও ম্লানমুখী। যেসব জাতি বর্তমানে সভ্যতার শীর্ষস্থানে পৌঁছে গেছে একটু সুক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে বুঝা যাবে যে তারা দুর্বলতার শিকার। বরং দুনিয়ার সমগ্র জাতির মধ্যে চরম উন্নত জাতিগুলোই পুনরায় বর্বরতা ও উৎশৃংখলতা অবলম্বন করে আসছে।"

আমেরিকার নিহত প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি ১৯৬২ সালে এক গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতিতে বলেছিলেন আমেরিকার ভবিষ্যৎ বিপদ সংকুল কারণ লোকেরা যৌন চর্চার পঙ্কিলতায় আচ্ছন্ন। তারা নিজেদের দায়িত্বের বোঝা বহন করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। সামরিক

বাহিনীতে যোগদান করার জন্য আশা প্রতি সাত জন যুবকের মধ্যে ছয়জনই ব্যর্থ ফিরে গেছে। কারণ তাদের লালসা-কামনা দৈহিক ও মানসিক অবস্থাকে তীব্রভাবে পর্যুদস্ত করে দিয়েছে।বৈদেশিক মন্ত্রণালয় থেকে ৩৩ জন কর্মীকে বহিষ্কার করা হয়েছিল শুধু এই কারণে যে যৌনতার ক্ষেত্রে চরম উৎচ্ছৃল হয়ে পড়েছিল। আর এ কারণে গোপনীয়তা সংরক্ষণের দিক দিয়ে তারা মোটেই নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত বিবেচিত হচ্ছিল না।"

Dr. Cyril Garbett বলেন:

"বর্তমানে মানুষ ইতিহাসের জটিলতম সংকটে নিপতিত। সভ্য মানুষ বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। সে এমন এক খাড়া স্থানে এসে দাঁড়িয়েছে যেখান থেকে এক ধ্বংস গহব্বরে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। সেখানে পড়ার পর হয়তো উদ্ধার পাবার আর কোন উপায় কোনদিনই খুঁজে পাবে না।"

Stah Wood Cobb বলেন:

"আধুনিক বস্তুবাদী সভ্যতা অনেকগুলো আভ্যন্তরীণ বৈপরীত্য ও অসামঞ্জস্যে পরিপূর্ণ। এই বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয় কথা ও কাজের মধ্যে, চিন্তা ও বক্তব্যের মাঝে, যুক্তি ও অনুভূতির মধ্যে। বস্তুবাদী সভ্যতা নানান ধরনের অভিব্যক্তির মাঝে সকল মানুষের সাম্যের কথা ঘোষণা করেছে। কিন্তু কার্যত নৈতিক বুদ্ধিবৃত্তিক সামাজিক পরিসরে অসাম্য অবিচারের জন্ম দিচ্ছে এবং এই মন্দ গুলোকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করছে।"

দার্শনিক কবি ড: আল্লামা ইকবাল Reconstruction of Religious Thought in Islam বইতে লেখেন একালের মানুষ তার বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের ফলশ্রুতিতে আর হৃদয়বান হিসেবে জীবনযাপন করতে পারছে না। চিন্তার জগতে সে নিজেই নিজের বিরুদ্ধে লড়ছে। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সে অপরের সাথে সংঘাতরত। বাস্তব ঘটনার বেড়াজালে আপন সত্তার গভীরতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।"

পারমানবিক বোমা আবিষ্কারের পর অধ্যাপক বারবারসের ধ্বংসাত্মক কার্যকারিতা কথা চিন্তা করে বলেছিলেন বাধ্যতামূলকভাবে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা অনুশীলন না করলে মানব সভ্যতা রক্ষা করা সম্ভব হবেনা কারন মানুষ ধ্বংসের উপকরণ অনেক বেশি জোগাড় করে ফেলেছে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন পারমাণবিক বোমার নিয়ন্ত্রণ আর কোন অবস্থাতেই সেকুলার চিন্তা ধারার লোকদের হাতে দেওয়া যাবে না। এ বোমার নিয়ন্ত্রণ ভার অবশ্যই ধার্মিক নৈতিকতা সম্পন্ন লোকদের হাতে ফোন করতে হবে। "

এবার কিছু তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশিত করা হচ্ছে এ থেকে ধারণা করা সম্ভব হবে যে আজ কোথায় গিয়ে ঠেকেছে----

আজ যদি বিশ্ববাসীর গণভোট নেয়া হয় এই প্রশ্নের যে মানুষের কাছে সবচেয়ে প্রিয় বস্তু কোনটি? নিঃসন্দেহে উত্তর আসবে তার নিজের প্রাণ।

মানুষের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু এ প্রাণ একটি পবিত্র আমানত। যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া তা হরণ করা যায় না অথচ বর্তমান কিংবা বিগত শতাব্দীতে কত মানুষের প্রাণ বিনা দোষে,বিনা কারণে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ইতিহাস আর পূর্ণ তালিকা সংরক্ষণ করেনি। তারপরও ছিটে ফোঁটা কিছু হিসাব বিভিন্ন উৎস থেকে পাওয়া যায় ওরে কিছু তথ্য প্রদান করা হলো :

জাপানের হিরোশিমা পৌরসভার চেয়ারম্যান ১৯৪৯ সালের ২০ আগস্ট এক ঘোষণায় বলেন ১৯৪৫ সালের ৬ ই আগস্ট আমেরিকার নিক্ষিপ্ত এটম বোমাই যেসব মানুষ মারা যায় তাদের সংখ্যা থেকে ৪০ হাজার পর্যন্ত আর আহত হয় ৮০০০০।

*আর জাপানের নাগাসাকিতে এটম বোমার আঘাতে নিহত হয় ৪০,০০০ এবং আহত হয় ২০ হাজার মানুষ। নিহত আহতদের চেয়ে বেশি সংখ্যক লোক পরবর্তী পর্যায়ে বোমার তেজস্ক্রিয়তার কারণে সারাটা জীবন দুঃখে কষ্টে অতিবাহিত করে।

*প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় ১৯১৪ সালে এ যুদ্ধে ১ কোটি ৩০ লাখ লোক নিহত হয় আহত হয় 2 কোটি ২০

*AJP* Taylor তার The First World War বইতে উল্লেখ করেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে

ফ্রান্স হারায় ১৫ লাখ লোক

জার্মানি হারায় ১৫ লাখ লোক

ব্রিটেন হারায় ১০ লাখ লোক

আমেরিকা হারায় ৮৮ হাজার লোক

রাশিয়া হারায় সবার যোগফল থেকে আরো বেশি সংখ্যক লোক।

*Western civilization বইয়ের হিসেব অনুযায়ী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে টি ৫০ লাখ লোক নিহত হয়েছে দুই কোটি লোক পঙ্গুত্ববরণ করেছে।

নিউ ক্লিয়ার উইপেন্স নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে বর্তমানে পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী দেশগুলোর হাতে যে পারমাণবিক অস্ত্র মজুদ আছে সেগুলোর শক্তি হিরোশিমা নিক্ষিপ্ত বোমার শক্তির প্রায় ১০ লক্ষ গুণের সমান।

আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট জুনিয়র বুশ ইরাক ও আফগানিস্তানে আগ্রাসান  চালিয়ে কত নিরপরাধ মানুষ হত্যা করেছে ফিলিস্তিনে কত মানুষ নিহত হচ্ছে তার সংখ্যা  অগণিত।

বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে আল্লাহর দুনিয়ায় যে ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালিত হলো তাতে যে কোটি কোটি মানুষ নিহত হলো তাদেরকে কোন মানুষ পয়দা করেনি। তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন বিশ্ব জগতের মালিক মহান আল্লাহ তা'আলা। নিহতারা হতে পারে হিন্দু বা মুসলিম মধ্য বা খ্রিস্টান নগরবাসী বা পল্লীবাসী আর্য কিংবা অনার্য উপজাতি এরা সবাই আল্লাহর খলিফা তার নিজের প্রতিনিধি বিনা কারণে তাদের প্রাণ হরণের কারো কোন অধিকার নেই।

যারা এই অপরাধ সংগঠিত করল যারা এই অপরাধের লো যারা পরিকল্পনা গ্রহণ করল যারা হুকুম দিল তাদের সবাই সেকুলার চিন্তা ধারায় বিশ্বাসী ছিল এরা যদি সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী হতো তবে তারা হাইকোর্ট তো তারা আল্লাহর এত সংখ্যক খলিফা এত প্রতিনিধিকে হত্যা করত না এত নারী বিধবা হতো না এত সংখ্যক মানুষ শিশু এতিম হতো না বার অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতো না এ নরঘাটগেরা ইহজগৎবাদী সেকুলার তারা আখিরাত পুনরুত্থান শেষ বিচার বেহেশ দোজখে বিশ্বাসী ছিল না যদি তাদের বিশ্বাস থাকতো তাহলে তারা কোনদিন এ পথে আঘাত না মানবতায় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হত না মানুষকে অকারণে হত্যা করলে তার বিচারের মাধ্যমে ফাঁসি দেওয়া হয় যে ব্যক্তি লক্ষ লক্ষ লোক হত্যা করল ফাঁসি দেয়া সম্ভব নয় এ দুজনের অপরাধের মাত্রা সমান নয় ইহজগতে চাইলেও সত্যিকার অর্থে ইনসাফ কায়েম করা সম্ভব নয় ইনসাফ একমাত্র আল্লাহ করতে পারেন আর এজন্যই আখেরাতের ব্যবস্থা এস বিচারের প্রয়োজন। প্রয়োজন বিভিন্ন ক্যাটাগরির দোযখের। আল্লাহ তার ব্যবস্থা করেছেন পরিমাণ মতো সব ঠিকঠাক করে রেখেছেন।

পাশ্চাত্য সভ্যতায় এইডস আজ মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছে আমেরিকায় যৌন রোগে ভুগছে মোট জনসংখ্যার এক দশ মাংশ এর সাথে প্রতিবছর যোগ হচ্ছে প্রায় পাঁচ লাখ নতুন রোগী বিশ্বে আজ এইডস ধারণ করেছে যে প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর প্রহর গুনছে এ রোগের কোন ঔষধ আজও আবিষ্কার হয়নি বর্তমান বিশ্বে এইচআইভি এইডস এ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৩ কোটি ৩২ লাখ।

আত্মহত্যা: পাশ্চাত্য সেকুলার সভ্যতার আর একটা ভয়ঙ্কর দিক হচ্ছে আত্মহত্যা ।১৯৫০ সালের পর থেকে মার্কিন তরুণ তরুণীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা ৬০০% বৃদ্ধি পেয়েছে।

(সূত্র: Abnormal Psychology and Modern life)

জাপানি তরুণীরা আত্মত্যার ব্যাপারে আরো অগ্রসর। তারা প্রতিবছর দল বেঁধে এক সাথে আত্মহত্যা করে।

মাদকাসক্তি : আমেরিকায় প্রতিবছর দুই লাখ লোক মাদকাসক্তের তালিকায় শরিক হচ্ছে। যারা সাধারণত মদখোর তাদেরকে বাদ দিয়ে এ তালিকা।

(সূত্র: Abnormal Psychology and Modern life)

অপরাধ প্রবণতা: ১৯৬০ সালের পর থেকে আমেরিকায় বিভিন্ন অপরাধ ৪০০% বৃদ্ধি পেয়েছে সেখানে প্রতি সেকেন্ডে একটি গুরুতর অপরাধ এবং প্রতি 16 সেকেন্ডে একটি মারাত্মক অপরাধ সংগঠিত হয়।

২০০৭ সালে অক্টোবর জাতীয় দৈনিক মানবজমিনে একটি খবর প্রকাশিত হয় খবরের শিরোনাম ছিল বৃটেনে টিউশন ফি বৃদ্ধি পাওয়ায় যৌন পেশায় নেমেছে

২০০৭ সালে বিশ্ব বিখ্যাত পত্রিকার নিউজ উইক নারীদের উপর একটি জরিপ বাস করে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় প্রতি সেকেন্ডে একজন নারী নির্যাতনের শিকার হয়। প্রতি ৬ মিনিটে একজন ধর্ষণের শিকার হয় প্রতি ষোল জন নারীকে ধর্ষণের মোকাবেলা করতে হয়

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের স্ত্রী, আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিনেটর হিলারি ক্লিনটন ১৯৯৬ সালে একটি বই লিখেন (It takes village)

সেই বইতে তিনি উল্লেখ করেন বছরের প্রায় ৭ হাজার শিশু খুন ও আত্মহত্যার প্রতি চার শিশুর একজন অবিবাহিতা মায়ের ঘরে জন্ম নেয় বেশিরভাগ অপ্রাপ্তবয়স্কা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫৪% মহিলা তাদের স্বামীদের চেয়ে কুকুরকে বেশি ভালবাসে।

চিলির নোবেল পুরস্কার বিজয়ী কবি জেব্রিয়েল আমস্ট্রং বলেন যে সমাজে ১২ বছর বয়সীর ও সন্তান জন্ম দেয় এবং ১৫ বছর বয়সীরা একে অন্যকে খুন করে সে সমাজ টিকে থাকতে পারে না।

## মুসলিম বিশ্বের সেকুলারিজম :

পূর্বেই বলা হয়েছে সেকুলারিজম প্রাচ্য দেশীয় মতবাদ নয়। এটা মানব মস্তিষ্ক প্রসূত সম্পূর্ণ একটি পাশ্চাত্য মতবাদ। ইউরোপের রেনেসাঁ যুগে এই মতবাদের জন্ম হয়। মুসলিম বিশ্বে এমন কিছু নেতা ছিলেন যারা পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ করতেন। তাদের মধ্যে কামাল আতাতুর্ক একজন। তিনি সর্বপ্রথম তুরস্কে সেকুলারিজম আমদানি করেন। তিনি তুরস্কের সেনাপ্রধান ছিলেন।

১৯২২ সালে কামাল আতাতুর্ক উসমানী সালতানাতের পতন ঘটিয়ে তুরস্কের রাষ্ট্রপতির পদ দখল করেন। ১৯২৩ সালের ২৯ অক্টোবর তিনি আইনের মাধ্যমে খিলাফতের বিলুপ্তি ঘোষনা করে তুরস্ককে একটি সেকুলার রাষ্ট্রে পরিণত করেন। খিলাফায়ে রাশেদের যুগ থেকে মুসলিম বিশ্বে ‘খিলাফত ব্যবস্থা’ চালু ছিল। খলিফা ছিলেন সমগ্র মুসলিম বিশ্বের প্রধান। ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানরা ‘খিলাফত আন্দোলন’ করেছিলেন খিলাফত ব্যবস্থা সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে।

তিউনিসিয়া:

তিউনিসিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান হাবিব বারগুইবা এক আদেশবলে তার দেশে মহিলাদেরকে হিজাব স্কার্ফ পরতে পড়তে নিষেধ করেন। –সেদেশের অর্থনৈতিক উন্নতি প্রবৃদ্ধি কমে যেতে পারে এ আশঙ্কায় সরকারি চাকরিজীবী, শ্রমিক ও উৎপাদনের সাথে জড়িত কাউকে পবিত্র রমজান মাসে ফরজ রোজা রাখতে দেয়া হতো না।

বাংলাদেশ:

বাংলাদেশের সংবিধান ১৯৭২ সালের চার নভেম্বর গৃহীত হয় এবং ১৬ ডিসেম্বর বলবৎ হয়

সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়–

“জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে।”

৮ নং ধারার ১ নং উপধারায় লেখা হয় “জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা– এই নীতিসমূহ হইতে এবং তৎসহ এই নীতি সমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত সকল নীতি রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি বলিয়া উপরিগণিত হইবে।”

১৯৭২ সালের সংবিধান কার্যকর হবার পর বাংলাদেশ সেকুলার রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এ দেশে ইসলামের নামে কোন রাজনৈতিক দল, কোন সমিতি, কোন সংগঠন করা আইনত নিষিদ্ধ হয়। অথচ এ দেশে কামিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ, বাসদ, প্রভৃতি কার্ল মার্কস, লেনিন, স্টালিন, মাও সেতুং এর আদর্শ বাস্তবায়নকারী দল কাজ করতে থাকে।

সে সময়ের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম থেকে কুরআনের আয়াত "রব্বি জিদনি ইলমা" এবং ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের মনোগ্রাম থেকে "ইকরা রব্বী যিদনী ইল্মা" মুছে ফেলেন। এভাবে সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ফজলুল হক মুসলিম হল, জাহাঙ্গীরনগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেওয়া হয়। ঢাকা ইসলামিয়া ইন্টারমিডিয়েট কলেজের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় কবি নজরুল ইসলাম কলেজ। কিন্তু নজরুল ইসলামের 'ইসলাম" তাদের সহ্য হয় না। কিছুদিন পর ইসলাম বাদ দিয়ে কলেজটির নাম রাখা হয় কবি নজরুল কলেজ এভাবে যেখানে 'ইসলাম' ও 'মুসলিম' শব্দ পাওয়া গেছে সেখান থেকে এ দুটো শব্দ বাদ দেয়া হয়েছে।

এ সময় দেশের শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য ডাক্তার কুদরত ই খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। কমিশনের রিপোর্টে বলা হয় প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা যাবে না। এর ওপরের স্তরের কোন শিক্ষার্থী ইচ্ছা করলে অপশনাল সাবজেক্ট হিসেবে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। মসজিদের নগরী ঢাকায় সরকারি উদ্যোগে ও পৃষ্ঠপোষকতায় অসংখ্য মূর্তি স্থাপন করা হয়। পাঠ্যপুস্তক থেকে প্রিয় নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনী পাঠ উঠিয়ে ফেলা হয়।

ইসলাম ধর্মের সঠিক সংজ্ঞা হল—- 'প্রত্যেক নবী রাসূলের কাছে আল্লাহর তরফ থেকে ফেরেশতা সরদার জিব্রিল আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে মানুষের জন্য যে হেদায়েত বা জীবনযাপন প্রণালী এসেছে সে হেদায়েতের একটি কুরআনি পরিভাষা হলো 'দ্বীন'। বাংলা অনুবাদ আমাদের সমাজে প্রচলিত হয়ে গেছে 'ধর্ম' হিসেবে। শুধু মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপারের সাথে সম্পর্কিত নয়, ধর্ম মানুষের জীবনের সার্বিক দিকের সাথেও সম্পৃক্ত।

ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার অর্থাৎ জনগণের এ বক্তব্যের দুটি অংশ:

ক) ধর্ম যার যার,

খ) রাষ্ট্র সবার অর্থাৎ জনগণের।

রাষ্ট্র তথা দেশ বলতে নির্দিষ্ট ভূখণ্ড উপর বসতো সম্পদ জলজ সম্পদ ভূপৃষ্ঠ সম্পদ সম্পদ এবং সমুদ্রসীমা থাকলে উপকূলস্থ সম্পদ ইত্যাদি বুঝায় দেশ তথা রাষ্ট্র জনগণের হলে রাষ্ট্রের সম্পদের মালিক জনগণ নাগরিক হিসেবে আমিও রাষ্ট্রের সম্পদের একজন মালিক ১৫ কোটি ভাগের এক ভাগের মালিক অন্যান্য সম্পদের কথা বাদ দিলাম খনিজ সম্পদের ওপর আমার দাবি উত্থাপন করছে বাংলাদেশের অভ্যন্তর থেকে কোটি কোটি টাকার খনিজ সম্পদ আহরণ করা হয়েছে এ সম্পদের কমপক্ষে ১৫ কোটি ভাগের এক ভাগের মালিক।

আমি আমার অংশ আজ পর্যন্ত বুঝে পাইনি টাকা যাদের কাছে আছে তারা ভবিষ্যতে আমাকে আমার অংশ বুঝিয়ে দেবেন এমন আলামত দেখতে যদি আমি আমার অংশের জন্য মামলা করি এবং শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টে যাই সেই কোর্ট ও আমাকে অংশ বুঝিয়ে দিবে এমন সম্ভাবনা দেখছি না। বিচারপতিগণ তাদের অংশ বুঝে পাননি, তাহলে আমি সম্পদের মালিক হলাম কিভাবে? আর জনগণ দেশ ও রাষ্ট্রের সম্পদের মালিক হলো কোন নৈতিক অধিকারে? বাস্তবেই যদি জনগণ মালিক হত তাহলে প্রত্যেকে তার অংশই বুঝে পেতো।

প্রকৃত সত্য হলো দেশ ও দেশের খনিজ, বনজ, জলজ ইত্যাদি কোন সম্পদের মালিক জনগণ নয়। দেশের একখণ্ড মাটি, মাটির গুনাগুন, একটি মাছ, একটি গাছ, একটি পশু, একটি পাখি, বাতাসের সামান্য অক্সিজেন, একটি বৃষ্টির ফোটা, নদী নালার পানি আরে প্রতিদিন সালাম করছে না ইত্যাদি কোনো কিছু মানুষ সৃষ্টি করেনি। এ সবকিছুর স্রষ্টা হলেন মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। তিনিই সবকিছুর মালিক। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সব কিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ। 'লিল্লাহি মা ফিসসামাওয়াতি ওয়া ফিল আরদ।''

'আকাশ রাজ্য ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর' (সূরা বাকারা আয়াত ২৮৪)। আকাশ রাজ্য ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহর। তিনিই মালিক যেসব জিনিসের যা আসমান ও জমিনের আছে। আর যা আছে আসমান ও জমিনের মাঝখানে এবং মাটির গর্ভে ( সূরা তোহা: আয়াত ৬)।

'বল প্রতিটি জিনিসের সৃষ্টিকর্তা কেবলমাত্র আল্লাহ তাআলা। তিনি একক, তিনি সর্বজয়ী' (সূরা রাদ্ব: ১৬)।

আল্লাহ মানব জাতিকে তার খলিফা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। ‘ইন্নি যা- ঈ- লুন ফিল আর্দ্বি খালিফা।”

তিনি মানুষের জন্য পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। ‘তিনিই সেই স্বত্তা যিনি বলেন, হে মানুষ তোমাদের জন্য পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টি করেছি (সূরা বাকারা আয়াত:২৯)। সুতরাং জনগণ সবকিছুর মালিক নয়, তবে মানুষ হোক সে হিন্দু বা মুসলমান, বৌদ্ধ বা খৃস্টান। সাদা বা কালো, নারী কিংবা পুরুষ, সবাই আল্লাহর খলিফা, তার প্রতিনিধি এবং সবকিছুর ভোগাধিকারি। সবকিছু মানুষের খেদমত করবে, মানুষ সবকিছু ভোগ করবে। যেহেতু সে সৃষ্টিকর্তার খলিফা বা প্রতিনিধি। প্রতিনিধি হিসেবে আল্লাহর মালিকানাধীন।

মানুষ সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছা মত ব্যবহার করবে। সে যেহেতু কোন কিছুর মালিক নয়। কোন কিছু তার মালিকানাধীন নয়।

সুতরাং তার নিজের মর্যাদাকে উপলব্ধি করতে হবে। সে মালিকের ইচ্ছার বাহিরে নিজের ইচ্ছা বা আইন প্রয়োগ করলে হবে স্বেচ্ছাচারী, মালিকের অস্বীকারকারী, আমানতের খেয়ানতকারী, জুলুমবাজ ও অকৃতজ্ঞ।

মানুষকে অনুভব করতে হবে– আমি সৃষ্টির সেরা, সবকিছু আমার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, আমার মর্যাদা সবার উপরে, কারণ আমাকে নিজের প্রতিনিধির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে সবকিছুর ওপর তার ইচ্ছা কার্যকর করার দায়িত্ব প্রদান করেছেন। এই উপলব্ধি যার মধ্যে আসবে সে মর্যাদার আসনে সমাসীন হতে পারবে, হতে পারবে আমানতের হেফাজতকারী। সেও কর্তব্য সঠিকভাবে পালনকারী, সফলকাম ব্যক্তি, সত্যিকারের কল্যাণকামী, বিশ্বস্ত ও কৃতজ্ঞ।

অতএব দেশ ও রাষ্ট্রের প্রতিটা ব্যক্তি– হোক সে কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবী, সংস্থা প্রধান, সমাজ প্রধান, সরকার কিংবা রাষ্ট্রপ্রধান তাকে এ অনুভূতি নিয়ে কাজ করতে হবে যে, ‘আমি সৃষ্টিকর্তার প্রতিনিধি’।

আমাকে সৃষ্টিকর্তা বিরাট সুযোগ প্রদান করেছেন, আমার ওপর কর্তব্যের বিরাট বোঝা। আমাকে স্বেচ্ছাচারী হলে চলবে না, আমানতের খেয়ানত করা যাবে না।

মালিককে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে আমাকে সব কাজ সম্পন্ন করতে হবে। সর্বপ্রকার নেয়ামত যা আমি ভোগ করছি, সে নেয়ামতের জন্য কাল আখিরাতের আদালতে জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হতে হবে।

## ধর্ম যার যার:

এ কথা দ্বারা সেকুলার ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা বুঝাতে চাচ্ছে যে, যারা ধর্ম পালন করতে চায় তারা ব্যক্তিগতভাবে পালন করুক। তাতে তাদের কোন আপত্তি নেই, তবে রাষ্ট্রে যেহেতু হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-ক্রিস্টান, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সবার বসবাস (আমাদের দেশের জন্য প্রযোজ্য), সুতরাং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপার সমূহে যারা সেক্যুলার, যারা ধর্মনিরপেক্ষবাদী তাদের হাতে তুলে দিতে হবে। তারা তাদের ইচ্ছা ও খেয়াল খুশি মতো আইন প্রণয়ন ও সরকার চালাবে। ধার্মিক লোকেরা ব্যক্তিগত গণ্ডির সীমারেখার মধ্যে ধর্ম পালন করবে। এর বাহিরে ধর্মের কোন অবস্থান থাকবে না।

এর অর্থ দাঁড়ায় তারা অতি চালাকি করে ধার্মিক লোকদের বোকা বানিয়ে, বঞ্চিত করে রাষ্ট্র দায়-দায়িত্ব ও সরকারি কর্মকান্ড পরিপূর্ণভাবে তাদের কব্জায় নিয়ে যেতে চায়।

'ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার' এ বাক্যের একটি দৃষ্টিভঙ্গি আলোচিত হলো।

ইসলাম ধর্মের ওপর সেকুলাররা অভিযোগ উঠায় যে ইসলাম একটি সাম্প্রদায়িক ধর্ম। সেকুলারদের এ অভিযোগ ঠিক নয়, কারণ ইসলাম কোন মানব রচিত ধর্ম নয়।

এ ধর্ম সমগ্র বিশ্বজগৎ ও সৃষ্টিকুলের স্রষ্টা মহান আল্লাহ তায়ালা শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এ ধর্মের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন, বিয়োজন করার অধিকার কোন মানুষের নেই। ইহজগতের সর্বশিক্ষিত শ্রেষ্ঠতম মানব সর্বশেষ নবী ও রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আল্লাহি। যার ওপর আসমানী আল কুরআন নাযিল হয়েছিল তার নিজেরও কোন কিছু সংযোজন বিয়োজন করার অধিকার ছিল না।

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, "এই নবী যদি কোন কথা রচনা না করে আমার নামে চালিয়ে দিত তবে আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং কণ্ঠশিরা ছিন্ন করে ফেলতাম।" (সূরা আল হাক্কা আয়াত: ৪৪ ৪৫ ও ৪৬)।

আল্লাহ মানুষের সৃষ্টি কর্তা, মানুষ আল্লাহর খলিফা তথা প্রতিনিধি।

সৃষ্টির প্রতি তার কোন বৈষম্য নেই তার সৃষ্টি মাটি, পানি, আগুন, রুদ্র-জোসনা, বৃষ্টির পানি, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফল-ফসল, গাছ, বন-জঙ্গল, মাছ, পশু পাখি, পর্বত-রাজি, নদী-নালা, খাল-বিল জীবজন্তু ইত্যাদি কোন বিশেষ সম্প্রদায়, কালের জন্য বা এলাকার জন্য নয়। বরং এগুলো সর্বকালের, সর্ব যুগের, সব মানুষের জন্য।

অতএব. আল্লাহর প্রেরিত ধর্ম কোন সম্প্রদায়ের জন্য নয় কোন কালের জন্য নয় কোন বিশেষ এলাকার জন্য। আল কোরআনে মানুষকে আহবান করা হয়েছে এ ভাষায় ইয়া আইয়ুহান নাচ অর্থাৎ হে মানব মন্ডলী।

সুতরাং ইসলামকে সাম্প্রদায়িক ধর্ম বলা অযৌক্তিক ও অসংগত।

ইসলাম পবিত্র ধর্ম, ধর্মকে রাজনীতিতে টেনে আনা উচিত নয়।

উপরোক্ত কথার প্রেক্ষিতে তিনটি কথা:

প্রথমত নীতিগতভাবে একটি কথা বলতে হয়, রাজনীতি যারা করেন তারা জনগণের মন জয় করে তাদের ভোটে নির্বাচিত হতে চান। নির্বাচনের সময় একটি স্লোগান সর্বত্র শোনা যায়। তা হল, "অমুক ভাইয়ের চরিত্র ফুলের মত পবিত্র"।

সুতরাং যারা ফুলের মত পবিত্র তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন এবং বিজয়ী হয়ে জনগণের খেদমত করতে চান। মানুষের খেদমত করা হক্কুল ইবাদ —- সৃষ্টির সেবা অত্যন্ত পবিত্র কাজ। যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন তারাই রাজনীতি করেন, তারাই সৃষ্টির সেরা মানুষ। তথা দেশ ও দশের খেদমত করতে চান। তাদের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও নিয়ত পবিত্র। আর তাদের চরিত্রও ফুলের মত পবিত্র। অতএব তারা রাজনীতিকে অপরিচ্ছন্ন করবেন না। রাজনীতিকে পবিত্র রাখবেন এটাই সর্বসাধারণের কাম্য।

দ্বিতীয়তঃ উপরোক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মকে পবিত্র বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। পবিত্র ধর্মের অঙ্গচ্ছেদ করলে ধর্মকে প্রতিবন্ধী বানিয়ে ফেলা হবে। সুতরাং সবার খেয়াল রাখা দরকার পবিত্র ধর্মের অংগহানি যেন না হয়।

তৃতীয়ত আল্লাহ মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি প্রদান করে সৃষ্টি করেছেন। স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি সহ মানুষের সম্পূর্ণ সত্তাকে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করার নামই ইসলাম। মানুষের কাছে আল্লাহর প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত হল ইসলাম। ইসলাম মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার নাম। এখানে জীবনের এমন কোন দিক নেই যা বাদ পড়েছে।

আল্লাহ নিজেই বলেন, 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। আর আমার নেয়ামতকে পূর্ণ করলাম আর তোমাদের জন্য আর তোমাদের জন্য ইসলামকে তোমাদের প্রধান হিসেবে কবুল করলাম।' (সূরা মায়েদা আয়াত:০৩) অতঃপর আল্লাহর তরফ থেকে মানুষের জন্য হুকুম এল--- 'তোমরা পূর্ণরূপে রূপে ইসলামে দাখিল হও। শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না।' (সূরা বাকারা আয়াত:২০৮)। তারপর আল্লাহর পক্ষ থেকে সাবধান বাণী এলো তোমরা কি আল্লাহর

কিতাব এর কিছু অংশ বিশ্বাস করো? জেনে রেখো তোমাদের মধ্যে যারা এমন আচরণ করবে তাদের এতদ্ব্যবতীত আর কি শাস্তি হতে পারে যে, তারা দুনিয়ার জীবনে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে থাকবে এবং পরকালে তাদেরকে কঠিনতম আজাবের দিকে নিক্ষেপ করা হবে। তোমাদের কাজকর্মের ব্যাপারে আল্লাহ মোটেই বেখবর নন।' (সূরা বাকারাহ আয়াত:৮৫)

'হে নবী, আপনি কি ওই সব লোকদের দেখেননি, যারা দাবি করে তারা ঈমান এনেছে তার ওপর নাযিল করা কিতাবের উপর এবং ঐসব কিতাবের উপর যা আপনার পূর্বে নাযিল করা হয়েছিল। কিন্তু তারা তাদের যাবতীয় ব্যাপারে ফায়সালা করার জন্য তাগুতের কাছে যেতে চায়। আর তাগুতকে অস্বীকার করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে সঠিক পথ থেকে বহু দূরে নিয়ে যেতে চায়।' (সূরা আন নিসা আয়াত:৬০)

*তাগুত* মানে আল্লাহ বিদ্রোহী শক্তি। তাগুত কাফির থেকে মারাত্মক। কারণ কাফের আল্লাকে অস্বীকার করে। অপরদিকে তাগুত জনগণকে আল্লাহর আনুগত্য করতে বাধা প্রদান করে। শুধু তাই নয়, আল্লাহর আনুগত্যের পরিবর্তে তার আনুগত্য করতে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বাধ্য করে। তাগুত আল্লাহর কালাম মহাগ্রন্থ আল কুরআনকে সর্বোচ্চ সনদ হিসেবে মানতে অস্বীকার করে এবং মানব রচিত আইনের মাধ্যমে বিচার ফয়সালা করে।

পবিত্র ধর্মের সম্পূর্ণরূপে দাখিল হতে হবে। ধর্মের এক অংশ মানবো আর অন্য অংশ মানবো না, – এরকম করা যাবে না।

যদি আমি কোরআনের একটি আদেশ তথা আল্লাহর একটি নির্দেশ অস্বীকার করি তাহলে আমি কাফির হয়ে যাব। কিন্তু যদি স্বীকার করি কিন্তু বাস্তবায়ন করতে গাফিলতি করি তাহলে হব মুনাফিক। আর মুনাফিকের অবস্থান হবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে। (সূরা আন নিসা : ১৪৫)

এছাড়া দুনিয়ার জীবনে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে থাকবে এবং পরকালে কঠিন আজাবের সম্মুখীন হবে। সুতরাং ধর্মকে পবিত্র বলে গ্রহণ করার পর যথাযথ মর্যাদা দিতে হবে। ধর্মকে তার নিজস্ব স্থান থেকে টেনে নিচে নামানো যাবে না। বরং পবিত্র ধর্ম ইসলামের কোন দিক ও বিভাগের বাইরে অবস্থান করি কিংবা আমার কোন কার্যকলাপ ধর্মের আওতাভুক্ত না হয়, তাহলে আমার সম্পূর্ণ সত্তা ও কর্মকান্ডকে টেনে

এনে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র ধর্মের মধ্যে প্রবেশ করাতে হবে অন্যথায় আমার কি পরিণতি হবে তা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহসুবহানহু তা'আলা কালাম পাকে মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের যত দিক আছে রাজনৈতিক দিক সহ সর্ব বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেছেন। সব নির্দেশের গুরুত্ব সমান, কোন আদেশ অমান্য করার কোন সুযোগ নেই।

সুতরাং কোন মানুষ কিংবা মানব সমষ্টির কথায় পবিত্র ধর্ম ইসলামের কোন অংশ রহিত করার এখতিয়ার কোন মানুষের নেই। যিনি মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, যার উপর কোরআন নাজিল হয়েছে, তাঁকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেন, 'হে মোহাম্মদ! তাদেরকে বল, আমার এ কাজ নয় যে, আমার নিজের তরফ থেকে ধর্মকে কোন রদবদল করে নেব। আমি তো শুধু সে ওহীর অনুসারী, যা আমার নিকট পাঠানো হয়। আমি যদি আমার রবের নাফরমানী করি তাহলে আমার জন্য এক অতি বড় বিভীষিকাময় দিনের ভয় আছে''। সূরা ইউনুস:১৫)

ইসলাম ও পুঁজিবাদের পার্থক্যটা আমাদের বুঝতে হবে। বিশ্বের একক হচ্ছে মানুষ। মানুষের সংজ্ঞা কেমন তার ওপর নির্ভর করবে পুরো সিস্টেমটা কেমন। ইসলামের মতে মানুষ একটি আধ্যাত্মিক বা স্পিরিচুয়াল প্রাণী। উন্নতি মানে তার আধ্যাত্মিক উন্নতি। একজন মানুষ যত আধ্যাত্মিকভাবে উন্নত হতে থাকবে তত সে তার অস্তিত্বের পূর্ণতায় পৌঁছাবে। তার অস্তিত্বই 'আবদ' হিসেবে (দাস বান্দা)। আল্লাহ বলেন, আমি জ্বীন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি কেবল আমার ইবাদতের জন্য। অর্থাৎ একজন আবদ বা দাস হিসেবে আমরা যত পারফেকশনের দিকে যাব অত আমরা আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ করব। মানব জনম তত স্বার্থক হবে। আল্লাহকে চেনা হবে যত, আমাদের দাসত্ব তত বেশি সুনিপনভাবে পূর্ণ হবে। আধ্যাত্মিকভাবেও আমরা উন্নত হবো। মানুষের এই সংজ্ঞাটুকুর ওপর ইসলামের পুরো সিস্টেমটা দাঁড়ানো।

রাষ্ট্রব্যবস্থা বলতে সেকুলারিজমে বোঝায় সো কল্ড গণতন্ত্র। যেখানে সরকার বসাবে পুঁজিপতিরা (গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ এর মালিকরা)। Government by the পুঁজিপতি, of the পুঁজিপতি, for the পুঁজিপতি। নির্বাচনের ডোনার পুঁজিপতিরা, মন্ত্রিপরিষদে পুঁজিপতিরা, পলিসি হবে তাদের পক্ষে। অর্থ পাচার, ঋণ খেলাপি, কালো টাকা, শেয়ার বাজারে পুঁজি লুটপাট সব তারা করবে। কিন্তু তাদের পুতুল তাদের বিরুদ্ধে কিছু করবে না। তৃতীয় বিশ্বের পুঁজিপতিদের ওপরে আছে বিশ্বের পুঁজিপতিরা (বায়াররা, সাপ্লায়াররা) তারা বসায় তাদের সরকার।

ইসলাম 'আধুনিক' 'সর্বাধুনিক' ধর্ম। এর মানে এটা নয় যে বর্তমান আধুনিকতার সংজ্ঞায় ইসলামকে আসতে হবে। আপনার আমার আধুনিকতার খাপে ইসলামকে ঢুকতে হবে। বরং, 'ইসলাম আধুনিক' মানে হল ইসলামটাই আধুনিক, বাকি সব অ-আধুনিক। আমাকে আপনাকেই আমাদের অজ্ঞতা থেকে ইসলামের আধুনিকতায় এসে ঢুকতে হবে। ইসলাম কোন সমাঝতায় আসেনা।

আর যদি আমি আমার কুফরি চিন্তা-চেতনা, জাহিলি জীবন বোধ, জুলুমি সিস্টেমের সাথে ইসলামের সমঝোতা চাই, তবে যেন আমি জেনে নিই, 'লাকুম দ্বীনুকুম ওয়া লিয়া দ্বীন' । আমার জাহেলি দ্বীন, আমার সো-কল্ড আধুনিক চিন্তা চেতনার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। ইসলাম ইসলামের মত, আমি আমার মত।

## উপসংহার:

বস্তুত আমাদের সামনে এমন কিছু চিন্তা উপস্থাপিত হয়নি, যেগুলোর যথাযত উত্তর দেওয়া প্রয়োজন। তাহলে সঠিক ইলমের জবাব দিয়ে অন্যান্য সংশয়ের মত এগুলোর জবাব দেওয়া যেত। বরং আমরা আরব ও ইসলামী বিশ্বে সেকুলারিজমের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার একটা বৃহত্তর প্রবণতা দেখতে পাচ্ছি। আর এই প্রবণতা বা পরিস্থিতির ভীত স্থাপন করে দিচ্ছে এই চিন্তাগুলো। সুতরাং এই পরিস্থিতির মোকাবেলা আমাদেরকে এর সামগ্রিক প্রভাবকসহ করতে হবে। ইলমী জবাব তো মোকাবেলার সামান্য অংশমাত্র। এরজন্য বৃহত্তর সমাধান প্রয়োজন।

শরীয়ত অনুযায়ী বিচার করা দ্বীনের এক অকাট্য সুদৃঢ় মূলনীতি। তবে ইসলামী ও আরব বিশ্বে এই মূলনীতিতে কাঁপন ধরে গিয়েছে। 'ইসলামিককৃত নানা চিন্তা'এই কাঁপন গুলোর একটি। যে কারণে বহু মানুষের মনে এটির মত স্বতঃসিদ্ধ বিষয় নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। আমাদের এই মূলনীতি সংরক্ষণে জোর দিতে হবে যাতে মুসলিমদের এমন প্রজন্ম বেড়ে না উঠে যারা এটির ব্যাপারে উদাসীন বা অজ্ঞ।

## এই মূলনীতি জোরদার করার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো ভূমিকা রাখবে:

*এই মূলনীতির অবস্থান বর্ণনা করা, দলীল পেশ করা এবং এর উপর উত্থাপিত সংশয় দূর করা।

*আধুনিক পরিস্থিতিতে শরীয়তের শাসনকে কিভাবে দূরে সরানো হল সেই ইতিহাসের শিক্ষা প্রদান করা।

*এই মূলনীতি বা ভিত্তির সাথে সাংঘর্ষিক বুদ্ধিবৃত্তিক বিভিন্ন মতাদর্শের অবস্থা তুলে ধরা। যেমন : সেকুলারিজম, লিবারেলিজম।

*ব্যাখ্যামূলক বা সংস্কারবাদী বিভিন্ন চিন্তা যে সকল সংশয় উত্থাপন করে, সেগুলোর খন্ডন করা।

দ্বীন ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য হলো এটি অনুসারীদের হৃদয়ে দ্বীনের আত্মপরিচয়ে গর্বের অনুভূতি সৃষ্টি করে দেয়। মুসলিম আল্লাহর আনুগত্য করে, এই আনুগত্য করতে পারাকে গর্বের বিষয় মনে করে এবং বিশ্বাস রাখে যে, ইসলামী শাসনব্যবস্থা সকল স্থান ও কালের জন্য উপযুক্ত। যত রকমের ভুল, ব্যর্থতা বা ত্রুটি তার সবই মুসলিমদের পক্ষ থেকে ইসলামের বিধান যথাযথভাবে মানার ক্ষেত্রে ঘাটতি থাকার কারণে। এই আত্মগৌরবের অনুভূতি এজন্য যে, দ্বীনটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী।

মুসলিমরা দুর্বল হয়ে পড়লে, দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়লে বা দুনিয়াবি জীবনে লাঞ্ছিত হলেও তাদের মাঝে এই অনুভূতি দৃঢ় থাকে। কারণ এই শক্তি কোন বস্তুগত উপাদানের অনুগামী না।

এই অনুভূতি ইসলাম বিকাশে প্রভাব ফেলেছে। মুসলিমদের মাঝে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি ইসলামের বিস্তৃতি সাধনে বড় ধরনের অবদান রেখেছে বর্তমান যুগের একজন পশ্চিমা ঐতিহাসিক ইসলামে এই অনুভূতির ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য দিয়েছেন। ইসলামের বিপরীতে খ্রিস্ট ধর্মের প্রচারে খ্রিস্টান মিশনারিদের দুর্বল অবস্থানের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘তাদের সার্বিক অর্জন ছিল যত সামান্য। খ্রিস্ট ধর্মের সকল গোষ্ঠী ব্যর্থ হয়েছে ওই একটা ধর্মের প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে যেটা ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে। আর সেটি হল ইসলাম ধর্ম। এই ধর্ম কোন প্রকার প্রতিরোধ ছাড়াই ছড়িয়ে গিয়েছে। মিশনারী দল, আর্থিক সহযোগিতা, বৃহত্তর শক্তির সমর্থন প্রভৃতি কোন কিছু সাহায্য ছাড়াই। আফ্রিকার বিভিন্ন প্রান্ত ও এশিয়ায় নানা অঞ্চল জুড়ে ইসলাম ছড়িয়েছে। কেবল সমতার

শিক্ষায় ইসলামের বিস্তারে ভূমিকা রাখেনি বরং ইউরোপীয় শক্তির মূল্যবোধের ওপর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের বিশ্বাসও এতে ভূমিকা রেখেছে। খ্রিস্ট ধর্মের মিশনারিরা কখনো মুসলিম দেশে গভীরভাবে অনুপ্রবেশ করতে পারেনি, কিন্তু অমুসলিমদের বিভিন্ন সমাজে তারা সামান্য অনুপ্রবেশ ঘটাতে সমর্থ্য হয়েছে। সূত্র: ( এরিক হবসবম, আসরু রাসিক মাল {৪৮৬-৪৮৭})

ইউরোপীয় বিজয়ী শক্তির উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন মূলত ইসলামী মূল্যবোধের ব্যাপারে গর্ববোধের অনুভূতি থেকে সম্ভব হয়েছে। পরিস্থিতি যত কঠিনই হোক বা অবস্থা যত প্রতিকুলই হোক, একজন মুসলিমের হৃদয় সব সময় যেন জাগ্রত থাকে। পশ্চিমা সংস্কৃতির সামনে বশ্যতা বা পশ্চিমাদের প্রভাবের সামনে নতি স্বীকারের পথে এই অনুভূতি সবচেয়ে বড় বাধা। পশ্চিমা আধুনিক বিভিন্ন ধারণার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার মানসিকতা দূর করার ক্ষেত্রে এটি সবচেয়ে বড় প্রভাবক।

দ্বীনের পরিচয়ে আত্ম গৌরব থাকলে একজন মুসলিম এইরকম প্রিয় চিন্তা ও ধারণার কাছে আত্মসমর্পণ করা থেকে বেঁচে থাকে। এগুলোর চিন্তা কত ভিত্তি এবং ইসলামী বিধিবিধানের সাথে বিরোধের সীমারেখা অনুধাবন করতে পারে। আধুনিক গবেষক ও লেখকরা বিষয়টার দিকে বেশি পরিমাণে ইঙ্গিত দিয়েছেন। মুহাম্মদ আসাদ বলেন :

‘ আমরা যখন ইসলামের রাজনৈতিক চিন্তায় জনগণের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার প্রসঙ্গে কথা বলবো, তখন আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে যেন আমরা কড়াই থেকে উনুনে ঝাঁপ না দিই। আমরা যেন যুগ যুগ ধরে চলে আসা স্বৈরাচারকে বদলাতে গিয়ে এমন শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করে না বসি যার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই, কেবল জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটবে বলে আমরা সেটিকে যেন সমর্থন না যোগাই। সূত্র: (মিনহাজুল হুকম ফিল ইসলাম {৭৯-৮১})

পরিভাষাগুলো বদলে ফেললেই চিন্তা বদলে যায় না। গণতন্ত্রের সংস্কারের জন্য শুধু এর নাম বদলে ‘শূরা’ দিলেই হবে না। বরং ইসলামের সূরা তথা পরামর্শ সভার মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে। আর এ সকল মূলনীতির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ইসলামী শরীয়তের মূল্যবোধ আঁকড়ে ধরা এবং সেটি থেকে কোনভাবেই আলাদা না হওয়া। সূত্র: (তৌফিক আশ শাওয়ী, ফিকহুশ শুরা ওয়াল ইস্তিশারা। {৫৩৮}

একজন গবেষকের দায়িত্ব হল ইসলামকে প্রকৃতপক্ষে তেমন করেই বোঝা, ইসলাম প্রকৃতপক্ষে যেমন। ইসলামকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা যেন তার লক্ষ্য না হয়ে যায়।

ইসলাম নিয়ে যে সকল লোক পড়াশোনা করে যখন নৈতিক ব্যবস্থা গুলোর আধুনিক ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করে তখন কেবল প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভুল হয় এমনটা নয় বরং গবেষণার পদ্ধতিতেও বড় ধরনের ত্রুটি দেখা যায়। কারণ প্রত্যেক শাসনব্যবস্থার পৃথক দর্শন ইতিহাস ও প্রক্রিয়া আছে। ইসলামের শাসন নীতি কিছু কিছু শাসনব্যবস্থার সাথে আংশিক সাদৃশ্য রাখলেও এর পূর্ণ স্বতন্ত্র অধিকার আছে। আপন সত্যাগত পরিচয় এর পাশাপাশি বিশ্বাসগত ভিত্তিও ইসলামকে অন্য সবকিছু থেকে আলাদা করে। ইসলামের কোন শাসন প্রক্রিয়া হলে সেটি অবশ্যই ইসলামী চিন্তার নির্দিষ্ট ভিত্তি থেকে করতে হবে।

নিঃসন্দেহে সংশয়বাদ একটি নেতিবাচক ব্যবচ্ছেদ মূলক প্রক্রিয়া। এর উদ্দেশ্য যুক্তির আঘাতে আধুনিক যুগের মূর্তিগুলো ভাঙ্গা। যাতে মানুষ সত্যের আলো দেখতে পায়। এই অর্থে সবচেয়ে বড় মুসলিম সংশয়বাদীদের একজন ছিলেন ইব্রাহিম আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি অত্যন্ত চমৎকার ভাবে মুশরিকদের বিশ্বাসের অসরতা তুলে ধরেছিলেন। নক্ষত্র পূজারী মুশরিকের বিশ্বাসের অসামঞ্জস্যতা এবং অর্থহীনতা তুলে ধরার জন্য তাদের কথোপকথনের ধাঁচ কিছুটা অনুকরণ করেছিলেন।

ইতিহাসে এমন অনেক মুসলিম সংশয়বাদী ছিলেন, যারা বিপদজনক নানা দর্শনের পর্যালোচনা, সমালোচনা, ব্যবচ্ছেদ এবং ভীত ধংস করার জন্য নানান যৌক্তিক কৌশল কাজে লাগিয়েছিলেন। হারিয়ে যাওয়া এই শিল্পকে আমরা আমাদের পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। বিশেষ করে আমরা যখন এমন এক বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবেশে আছি যা ইসলামের প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন।

হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রেটরিক্যালি প্রশ্ন করেছিলেন, "আমরা কি হকের উপর নই?" নিঃসন্দেহে আমরাই হকের উপর আছি। সময় এসেছে সে আত্মবিশ্বাস নিয়ে কাজ করার।

একজন পশ্চিমা সংশয়বাদী কি করে? সে প্রশ্ন করে, যা কিছু নিজস্ব ধ্যান-ধারণার সাথে খাপ খায় না তার বিরুদ্ধে সে প্রশ্ন তোলে, আপত্তি করে। সে বিশ্বাস করে তার বিবেক, তার মন, তার বুদ্ধিই হল সত্য মিথ্যা এবং ভালো-মন্দ বিচারের চূড়ান্ত মাপকাঠি। বলাবাহুল্য, এ ধারণা ভুল।

একজন মুসলিম সংশয়বাদী কি করে? সে নিজেকে প্রশ্ন করে। নিজের কাজ, অনুভূতি এবং চিন্তার যা কিছু ইসলামের সাথে খাপ খায় না সেটার বিরুদ্ধে সে প্রশ্ন তোলে। আপত্তি করে।

কারণ সে জানে তার মন সীমিত, বুদ্ধিমত্তাও সীমিত। এগুলো কখনো সত্যের চূড়ান্ত মাপকাঠি হতে পারে না। সত্যের পরম চূড়ান্ত মাপকাঠি হতে পারে একমাত্র আল্লাহ সুবাহানাতালার শরীয়াহ বা ইসলাম।

মানুষ আজ বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক, ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা আর মতবাদকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করে। যত্ন করে লালন করে, সেগুলোর জন্য লড়াই করে। এগুলো হলো সত্যিকারের Weapons of Mass Destruction... এ ধরনের 'সত্য' ----এ বিশ্বাসী হবার চেয়ে সংশয়বাদী হওয়া হাজারগুণ ভালো।

ইসলামের মূল উদ্দেশ্য হল আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা। মানুষকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য কাটছাঁট না করে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ তুলে ধরাই অধিক ফলপ্রসূ। মানুষের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করানো আমাদের দায়িত্ব নয়। আল্লাহ এই ক্ষমতা কোন মানুষকেই দেননি। ফলে এমন কাটছাঁটের বিশেষ কোনো ফায়দা নেই। এতে সবচেয়ে বড় ক্ষতিটা হচ্ছে, আমরা মানুষকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে ফেলছি। আমরা ইসলামের পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশ করলে আল্লাহ যাকে হেদায়েত দিতে চান তার কাছে এটাই সত্য ও ইনসাফ মনে হবে। আর যাকে চান না তার কাছে গোঁড়ামি, বাড়াবাড়ি ইত্যাদি মনে হতে পারে। কিন্তু তার এই ধারণা দূর করার জন্য কাটছাঁটের অনুমোদন দেওয়া হয়নি। বরং আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে আপসহীন ভাবে ইসলাম যা বলছে তা পালন করে যাওয়া।

আমরা নিজেদের শরীয়ত নিয়ে এক ধরনের হীনমন্যতায় ভুগি। আমরাই নিজেদের শরীয়তকে এক রকম উগ্রতা, গোঁড়ামি, বেইনসাফী মনে করি। তা না হলে তো এসব বিধানের ব্যাপারে পাশ্চাত্যের সাথে আপসের নীতি গ্রহণ করার প্রয়োজন পড়তো না। আল্লাহ যে অধিকার অবস্থা ভেদে মানুষকে দিয়েছেন তা আসলেই ন্যায্য কিনা, এ ব্যাপারে আমরা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগি। আমরা কোন প্রকার তোষামদ ছাড়া বলতে পারিনা এটাই ন্যায় ও সত্য। এর একমাত্র কারণ আমরা পাশ্চাত্যের মানদণ্ড মেনে নিয়েছি। অথচ একটা সেকুলার রাষ্ট্রে কোন অ-সেকুলার বেঁচে থাকার অধিকার পায়না। যেখানে সেকুলারিজম অ–সেকুলারিজম নাগরিকদের ওপর হত্যা কিংবা বন্দির বিধান প্রয়োগ করতে কোন কপটতার আশ্রয় নেয় না, সেখানে কিভাবে আমরা নিজেদের শরীয়তের ব্যাপারে এমন কাপটতার আশ্রয় নিতে পারি?

অথচ আমাদের শরীয়ত এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি সবকিছুর মালিক সেকুলারও যার সৃষ্টি। স্রষ্টার সাথে বিদ্রোহ করার ব্যাপারে তারা এতটা আপোসীন হতে পারে আর আমরা রবের দাসত্বে আপোসহীন হতে পারছি না!!

ইতিপূর্বে সেকুলারিজমের যে সংজ্ঞা এ পরিণামের দিক থেকে সংজ্ঞাটা প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়। কারণ প্রকৃতপক্ষে সেকুলারিজম যদিও রাষ্ট্র থেকে আসমানী ধর্মকে পৃথক করে তবে ব্যক্তিগত বিষয় বলে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সে আত্মপুজারী আরেকটি ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করে। আরও স্পষ্ট করে বললে সেকুলারিজম নিজেই একটা ধর্ম।

এই ধর্মের শরীয়ত কিংবা সাংবিধানিক মাপকাঠি হলো হিউম্যানিজম। এই ধর্মের প্রভু হল মানুষ এবং জ্ঞানের উৎস হলো মানুষের বুদ্ধি বা আকল। সেকুলারিজম নিজেই একটি ধর্মীয় অথরিটি সংরক্ষণ করে। সে অন্যান্য ধর্মের ওপর তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। সকল ধর্মীয় অনুশাসনকে মাপকাঠিতে মূল্যায়ন করে। সে যদিও মুখে বলে যেসব ধর্মীয় নেতা পাবে কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, একজন ধর্মীয় ব্যক্তিকে তার ধর্মে ঘোষিত হালাল গ্রহণ করতে এবং হারাম বর্জন করার পথে বাধা সৃষ্টি করে। তার নিজস্ব হালাল হারাম তথা বৈধতা অবৈধতার ধারণা রয়েছে।

সেই ধারণার ভিত্তিতেই সে প্রতিটি বিষয়ের অনুমোদন দিয়ে থাকে। তার নিজস্ব বৈধতার ধারণার সাথে সাংঘর্ষিক যেকোন বিষয় সে বেআইনি এবং বাতিল করে দিতে পারে। মোটকথা একটি ধর্মের ফুল কনসেপ্ট সেকুলারিজমে বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং বলতে হবে, সেকুলারিজম কখনোই ধর্মনিরপেক্ষতা নয়, বরং সে নিজেই একটি ধর্ম।

সেকুলার চিন্তাধারার ওপর ভিত্তি করে বর্তমানে যে সমাজ ও রাজনৈতিক দর্শন চালু হয়েছে, সভ্যতা ও সংস্কৃতি, অর্থনীতি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে এ ব্যাপারে পৃথক একটি বই লেখা যেতে পারে।

কলেবর বৃদ্ধি না করে আপাতত তাই শেষ করা হলো।

## তথ্য সূত্র:

Wikipedia.., বই: সেকুলারিজিমের ইসলামিকরণ, পাশ্চাত্যবাদ কথা বলছে, অবাধ্যতার ইতিহাস, সেকুলারিজম, হিউম্যানবিয়িং।